চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন

শিবরাম চক্রবর্তী

শ্রী প্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট • কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৯

প্রকাশিকা
শুক্লা দে
শ্রী প্রকাশ ভবন
এ ৬৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা ১২

চিত্রসজ্জা
রেবতীভূষণ ঘোষ

মুদ্রাকর
কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১ কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলকাতা ৬

শ্রীমান সজল বন্দোপাধ্যায়

শ্রীমতী কৃষ্ণা বন্দোপাধ্যায়

জয়যুক্তেষু

চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন

॥ এক ॥

দুঃসংবাদে আত্মহারা !

সকালবেলায় খবরের কাগজের খানিকটা পড়েই বিচলিত হয়ে পড়েছে গোবর্ধন। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে : ভারি মুস্কিল তো !

কেন, কি হোলো আবার ? সামান্যমাত্র কৌতূহল হর্ষবর্ধনের ওঁর ভাইয়ের বিবেচনায় যা-মুস্কিল তাকে মুস্কিলের মধ্যেই তিনি গণ্য করেন না, বাতুলের প্রলাপের মতই অকাতরে বাতিল করে দ্যান।

গোবর্ধন কিন্তু নিজের সমস্যাকে নগণ্য জ্ঞান করতে পারেনা, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—নাঃ, টেঁকা দায় হোলো কলকাতায়! যা মুস্কিল দেখছি—

আবার সেই এক কথা---সেই বারম্বার বলার বাহুল্য ! বিনা বাক্যব্যয়ে গোবরাকে একটা কিল্ কসিয়ে দেবার প্রেরণা হয় হর্ষবর্ধনের। তিনি আত্মসম্বরণ করে নেন : কিসের মুস্কিল, শুনি ?

যা দেখছি খবর আজকের—গোবর্ধন মুখখানাকে হাঁড়িপানা করে আনে। দাদার অটলতাকে আমলই দেয় না সে।

আরে, খবর তো আমিও দেখছি ! হর্ষবর্ধন তাঁর মনের বিকার মুখের কথায় এবং মাংসপেশীতে পরিস্ফুট করেন : দেখছি নাকি ? কিন্তু কোন্ খবরটা ? মুস্কিল বাধালো কিসে ?

বাস্তবিক, খবরের কাগজ তো তিনিও পড়ছেন, অনেক খবরই পড়ে ফেলেছেন এতক্ষণে—কিন্তু মুস্কিলজনক কোনো দুঃসংবাদের কিছুই তো খুঁজে পান নি এখন পর্যন্ত।

প্রাতঃকালে আনন্দবাজারের প্রাচুর্ভাব হতেই, প্রথমেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন হর্ষবর্ধন, কাগজের প্রধান প্রধান প্রত্যঙ্গগুলি তিনিই আত্মসাৎ করে নেন আগে থেকে। আসল সার খবর এবং জ্ঞাতব্য যা-কিছু সবই রাখেন নিজের দখলে, কেবল খবরের ছিবড়েগুলো যাতে থাকে সেই জবড়জং পাতাগুলো ফেলে ভান গোবরাকে।

গোড়া থেকে সোজা ডগায় চলে যাওয়া, যেমন করে লোক গাছে ওঠে, হর্ষবর্ধনের কাগজ পড়ার সেই নিয়ম। কাগজকে পেড়ে ফেলে, তার আগাপাশতলা তিনি পড়ে ফ্যালেন, দরকার হলে তার ওপর শুয়ে পড়েও—হ্যাঁ—এবং—কোথ্থাও তার বাদ রাখেন না।

প্রথম পাতার প্রথম লাইন—অতিকায় অক্ষরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে তাঁর পাঠ সুরু হয়—তারপর, দৈনিক নীট্ বিক্রয় সংখ্যা এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার, এই অভ্রভেদী তথ্যকে গোগ্রাসে গিলে, দক্ষিণের ভট্টাচার্য মহাশয়ের চা-পানের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং বামের একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার নির্মাতার বিনামূল্যে ক্যাটালগ প্রদানের আবেদন অগ্রাহ্য করে, এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া এবং ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ প্রভৃতি অবলীলাক্রমে পেরিয়ে, একেবারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রশংসিত গৌরমার্কা ঘাঁটি সরিষার তৈলে এসে পড়েন। তারপর সেখান থেকে, স্বভাবতঃই, তিনি পিছলে পিছলে চলে যান সংবাদের বিভিন্ন প্রদেশে—শ্রীরামপুরের বঙ্গেশ্বরী কটন্ মিল, কুমিল্লার ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, নাথ ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল কেমিকেলের লাইমজুস্ য়্যাণ্ড গ্লিসিরিন কিছুই তাঁর বাদ যায় না। কোনো মূল্যবান খবরেরই ফস্কাবার উপায় নেই তাঁর খপ্পর থেকে, সর্বত্রই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এমন কি কর্মখালির খুঁটিনাটিতে পর্যন্ত তাঁর সমান তীব্র নজর।

কোন কোন ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতে কি কি সুবিধা, কোন বীমা

কোম্পানীর মেয়াদী বীমায় জেয়াদা লাভ, কোথায় নামমাত্র প্রিমিয়াম দিয়ে, একবার মরতে পারলেই হাতেনাতে স্বর্গ, তারপর জীবন-ধারণ না করলেও চলে, এমনকি কষ্টেস্থষ্টে বেঁচে থাকাটাই অবাঞ্ছনীয়ঃ কোনখানে জীবনবীমা করে, কোনো প্রকারে গতাসু হলেই আশু বড়লোক! সেই সব কাহিনী একে একে তিনি পড়েন। গল্পচ্ছলেই পড়েন এবং অকপটে বিশ্বাস করেন। এবং এক এক সময়ে দুর্দমনীয় লোভ হতে থাকে তাঁর—য়্যাঁ, একটা প্রিমিয়াম দিয়ে দেখলে হয় না? তারপরে কোনো গতিকে—?

হ্যাঁ, অতিকষ্টেই মারা পড়বার প্রলোভন সম্বরণ করতে হয়েচে তাঁকে বহুবার।

তারপর তাঁর 'পাত্র চাই, পাত্রী চাই' প্রভৃতি গলাধঃকরণের পালা। এইসব রোমাঞ্চকর ঘটনা—কিম্বা দুর্ঘটনা, যাই বলো, সব আগে উদরস্থ করার তাঁর সাধ হয়, রোজই—দুর্বার বাসনাই জাগে বলতে গেলে, কিন্তু প্রাণপণ-বলেই নিজেকে তিনি চেপে রাখেন। নিখুঁত রকমের নিরপেক্ষ লোক তিনি, সব খবরের প্রতিই তাঁর সমান অনাসক্তি! কোনো বিশেষ ইত্যাদির ওদিকেই ইতরবিশেষ হয়ে পড়বার তিনি নন। খবরের কাগজ পড়েন, যেমন পড়ার নিয়ম, একের পর এক, ওপর থেকে নীচ-বরাবর, ডাইনে-বাঁয়ে বিনা-দৃক-পাতে, লাইনের পর লাইন—একেবারে বদ্ধপরিকর হয়ে। চিরদিনের এই বদভ্যাস। ডিরেল্‌ড হবার পাত্র তিনি আদপেই নন্।

আসল আসল খবরগুলো দাদাই সব সারেন, বাধ্য হয়ে গোবরাকে বাজে খবর নিয়েই পড়ে থাকতে হয়। বড় বড়, মেজ মেজ, ছোট ছোট হরফে যত বিলিতি ব্যাপার—কিছুই জানবার কথা নেই তার মধ্যে, আর জানলেই—বুঝবার যো কী! একটা কাণ্ডও যদি তার বোঝা যায়। অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলা—তাতে তোমারই বা কি

আর আমারই বা কি, কষ্ট করে কে তা পড়ে? গোবরার তো অষ্ট রম্ভা! তারপর মিশরে ভীষণ সোরগোল, জার্মানীতে ইহুদিদের প্রতি অত্যাচার, প্যালেষ্টাইনে আরবদের তাণ্ডবলীলা—এসবের মাথামুণ্ডুও যদি কিছু বোঝা যায়! এর ওপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুতর পরিস্থিতি—পরিস্থিতি আবার কি রে বাবা? এবার একেবারেই পিলে চমকে যায় গোবরার।

এই সব খবরই পড়তে হয় গোবরাকে, বাধ্য হয়ে, বিরক্তির সঙ্গেই। দাদার হাস্য-বিকশিত বদন ছাখে, আর কাগজের যে সব পাতা দাদার বেহাতে, সেদিকে লোলুপ নেত্রপাত করে কেবল। কিন্তু নাঃ, এতক্ষণে—এবং এতদিনে—একটা চমৎকার খবর পেয়েছে সে। স্বহস্তেই পেয়েছে। পড়বার মত খবর—জবর খবরই বটে—পড়লেই বোঝা যায়, আর বুঝলেই বুক কাঁপতে থাকে ভয়ে।

হর্ষবর্ধন সবেমাত্র বায়স্কোপের পাতায় এসে পৌঁচেছেন, ছবির বিজ্ঞাপন দেখেই তাঁর সিনেমা দেখার কাজ সারা হয়—একবার সেই যা বাইশজনের কোপে তিনি পড়েছিলেন, সেই ঢের, আর বাইশ-কোপের সখ তাঁর নেই। এই সচিত্র সংবাদগুলো খুব সযত্নেই পুঙ্খানুপুঙ্খ তিনি পড়েন; পড়চেন আর এমন সময়ে কোনো রকমে হৃৎকম্প স্থগিত রেখে, দুঃসংবাদটি ব্যক্ত করে ফেলেচে গোবর্ধন।

ভারী ভাবনার কথা, বাস্তবিক! তবু ঘাবড়ায় না গোবরা।

হ্যাঁ, আমিও ভেবেছি—হর্ষবর্ধন হঠাৎ বুঝতে পারেন যেন—অনেকদিনই ভেবেছি। কিন্তু এতবড় কলকাতা শহর, তাতে আর আশ্চর্য কি!

বা, কলকাতা বলে কি এমনই হবে? গোবরার আশ্চর্যই লাগে—এতটাই হবে? উঠে পড়ে পায়চারী করতে সুরু করে দেয় সে, নিদারুণ উত্তেজনায়।

হবে না কেন ? বাড়ী ঘর কি কিছু কম আছে কলকাতায় ? আবার রোজই বাড়ছে কত ? বেড়েই তো যাচ্ছে।

বাড়ী ঘর বেশি বলে কি ছেলেরাও বাড়তি হয়েছে নাকি ?

গোবর্ধন বিস্ময়ে বিচলিত : আঁটছে না নাকি বাড়ীতে—তুমি বলছ কি দাদা ?

তা লাগে বই কি এত ইট। এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার আর বেশী কি এমন ?

ইট ?—গোবর্ধন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। অত হাজার ইটের একখানা যেন ছিট্‌কে এসে লাগে তার মাথায়—ইট কোথায় পাচ্ছ তুমি ?

কেন, এই তো! ছেপেই দিয়েছে তো! প্রথম পৃষ্ঠার প্রথমতম সংবাদের পৃষ্ঠে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করেন তিনি : এই তো এখানে লিখেছে নীট্ বিক্রয় সংখ্যা এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার। আর, আর—পুনশ্চ তিনি প্রাঞ্জল করে দ্যান—আর নীটও যা ইটও তাই !

বিস্ময়ের ধাক্কায় গোবরা চুপ মেরে যায়,—বলৎশক্তি লোপ পায় বেচারার।

তা লাগবে না ? বাড়ীঘর তৈরী হচ্ছে কম কি ? রোজই তো তৈরী হচ্ছে। হর্ষবর্ধন নিজেই প্রকাশ করেন : একখানা বাড়ীতেই তো লেগে যায় কত হাজার! কাঠই লাগে কত !

নীটের কথা কে বল্‌ছে ! ধীরে ধীরে বাক্যস্ফূর্তি হতে থাকে গোবরার।

আহা নীট কেন—ইট। হর্ষবর্ধন নিজেই প্রূফ সংশোধন করেন—নীট আবার কী ? তা কি বিক্রি হয় বাজারে ? কেউ কি নাম শুনেছে কখনো ? না, চোখে দেখেছে ? ওটা হবে গিয়ে ইট ! কলকাতার লোকের দশাই ঐ ! ওরা আমকে বলে আঁব

আর শিয়ালদহকে বলে শেয়াল-দা! ওদের উচ্চারণই ঐ রকম! দাদা বলে ডাকে ইষ্টিশনকে! হা-হা!

আমি কি ইঁটের কথা ভাবছি!—গোবরা দ্বিরুক্তি করে বসে।

কাঠের কথাই তো? হ্যাঁ, ভেবেছি আমিও। কিন্তু দৈনিক কাঠ বিক্রয়ের সংখ্যা কি ছাপবে ওরা? তা হলে তো আমাদের কাঠের ব্যবসা আরো কত ফলাও হয়ে পড়ে। কাঠও কিছু অদরকারী নয়, বিক্রিও কম হয় না, অন্ততঃ, ইটের চেয়ে কম নয় নেহাৎ, কিন্তু বলে কে!

ধুত্তোর কাঠ!

গোবর্ধন আর চুপ থাকতে পারে না, কাঠ না তোমার মাথা!

এবার রাগ হয়ে যায় হর্ষবর্ধনের। ইটে না হবি না হ, কিন্তু কাঠের কথাতেও দ্রবীভূত হয় না এমন অনুভূতিহীন ব্যক্তির হৃদয়দ্বারে —উঁহু, একেবারেই তা নিরর্থক, হয়তো অস্তিত্বই নেই হৃদয়ের—না, নিতান্তই তার পিঠের দিকের চৌকাঠে কিংবা কানের দোর-গোড়াতে প্রচণ্ড একটা করাঘাতের প্রবল বাসনা তাঁর অভ্যন্তরে নিদারুণভাবে জাগতে থাকে। অন্তর্গত ইচ্ছাটাকে প্রায় হস্তগত করে এনেছেন প্রায় এমন সময়ে বাধা আসে গোবর্ধনের তরফ থেকে: আমি বলছি অন্য খবর। ভারী উপদ্রব যে কলকাতায়!

উপদ্রব! কিসের উপদ্রব? হর্ষবর্ধন হক্‌চকান: ভূতের উপদ্রব নাকি? অল্প বিস্তর ভয়ই হতে থাকে তাঁর, হবেই তো; হওয়া স্বাভাবিক। উপদ্রব মানেই ভৌতিক, তা ছাড়া আর উৎপাৎ করবে কে? কার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? অত দুষ্টবুদ্ধি আর আছে কার? তাঁর ধারণায়, ভূত আর উপদ্রব ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

ভূত নয় তো? নীট্‌ ছুঁড়চে নাকি?

নাট্‌-পাটকেল্‌ ওরফে ইট-পাটকেল, ভূতেরাই ছুঁড়ে থাকে

কেবল। হর্ষবর্ধনের মতে (এবং অনেকের সাক্ষ্য আছে তাঁর সপক্ষে) নীট ছোঁড়া কর্ম হচ্ছে ভূতদের এবং কখনো সখনো রাজমিস্ত্রীর। কিরকম যেন বদভ্যাস ওদের! তা বাদে, পাগলরাও অবশ্য যোগ দেয় সেই সঙ্গে—কিন্তু সে ভয়ানক কদাচ।

কোথায় বেধেছে হাঙ্গাম? ভয়ে-ভয়েই তিনি জিজ্ঞেস করেন। আশেপাশেই না তোরে? এখন থেকেই বুকের গুড়গুড়ুনি স্বরু হয়ে যায় তাঁর।

উঁহু, ভূত নয়। ছেলেধরার উপদ্রব! গোবর্ধন বেফাঁস করে।

ছেলেধরার—তাই বল্! হালে পানি পান হর্ষবর্ধন। ছেলে-ধরার উপদ্রব তো কী হয়েছে! ভয়ের কী আছে তাতে? হেসেই ফ্যালেন তিনি। অম্লানবদনে হাসেন।

একদল বিদ্‌ঘুটে লোক এসেছে কলকাতায়, ছেলেদের ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম্ করে রাখছে, তারপরে বিস্তর টাকা আদায় করে ছেড়ে দিচ্ছে তাদের। বহুৎ ছেলে ধরে নিয়ে গেছে এই ক-দিনে। গোবর্ধন ব্যক্ত করে।

ছেলে ধরছে তো আমাদের কি! হর্ষবর্ধনের ইচ্ছে হয় এক্ষুনি গোবরাকে ধরে তিনি গুম্ করে দ্যান—সশব্দে তার অপর পৃষ্ঠে—অবারিত পৃষ্ঠদেশে—তার বোকামির পরাকাষ্ঠায়! আমাদের কি তাতে? আমরা কি ছেলে?

কেন, আমাদের কি ধরতে নেই? যার কাছে টাকা পাবে তাকেই ধরছে যে! তোমারও টাকা আছে, তোমাকেও—

আমি কি ছেলে, শুনি আগে? অন্যায় দোষারোপে তাঁর গা-জ্বালা করে, উষ্ণ কণ্ঠেই তিনি বলেন—ছেলে কি আমি?

তবে কি—তবে কি—আম্‌তা আম্‌তা করে গোবরা, তবে কি তুমি মেয়ে?

মেয়ে আমি? পাগল! গোবরার অমূলক সন্দেহ তাঁকে বিচলিত করতে পারে না, নিজের পরিপুষ্ট গোঁফের দুই প্রান্তে তিনি হস্তক্ষেপ করেন, তোর গোঁফ কই এমন? আমি যদি মেয়ে হই তুই মেয়ের অধম—মেয়েরও নীচে। তুই তবে নাতনি!
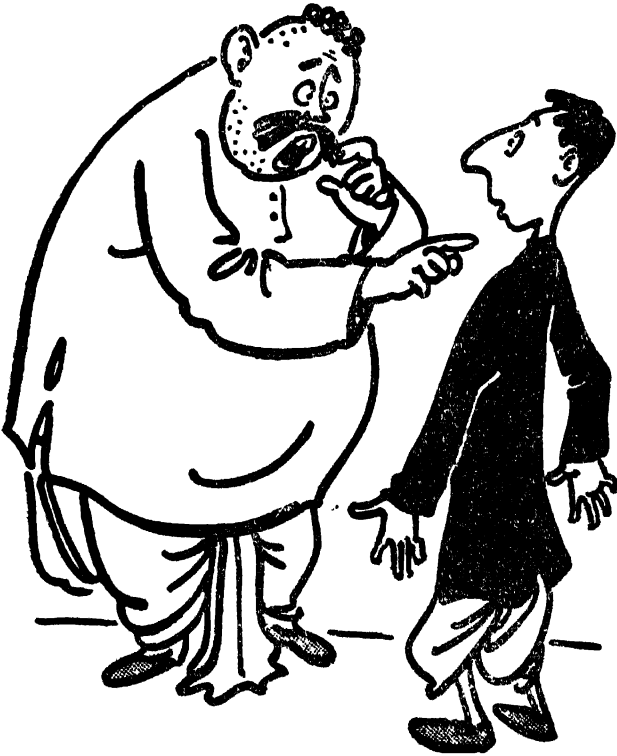
কিন্তু ছেলেও না, মেয়েও না, তুমি তবে কী? গোবর্ধন তাঁকে কোন-ঠাসা করে ফ্যালে।

হর্ষবর্ধন ভাবিত হন, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব তিনি ব্যক্ত করতে পারেন না ; ভাবনায় যদি বা কূল পান, ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারেন না,—তিনি যে কী, যদি বা নিজে কোনো রকমে জানা যায়, জানানো যায় না তা কিছুতেই প্রকাশের অক্ষমতায়, অগত্যা, বিশ্বস্রষ্টার মতই নিজের সম্বন্ধে তাঁকে মৌন থেকে যেতে হয় অবশেষে।

॥ দুই ॥

মহাপ্রস্থানের পথে

কিন্তু মৌনতা আর কতক্ষণ? অসম্মতির ক্ষেত্রে কাঁহাতক আর মৌনতা বজায় রাখা যায়? ক্রমশঃই তাঁর মাথা ঘুরতে থাকে! গোঁফকে পরিত্যাগ করে গালে হাত ত্থান হর্ষবর্ধন। এ যে আমূল তাঁর অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি! ভাবনার কথা, এমন কি দুর্ভাবনার কথাই, বাস্তবিক। দাড়ি চুলকোতে থাকেন তিনি: মেয়ে আমি নই—কিছুতেই না! তোর কি মনে হয় যে আমি মেয়েছেলে! য়্যাঁ?

আমি তো তা ধারণাই করতে পারি না। গোবর্ধন ব্যক্ত করে।

নিশ্চয়ই না। সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। জোরের সঙ্গেই জাহির করেন তিনি: আমার অটল বিশ্বাস যে আমি মেয়ে নই। তবে এও সঠিক যে ছেলেও আমি নই। এতখানি বয়েস হয়ে গেল, এখনও কি ছেলেই রয়েছি? আশ্চর্য!

বিস্ময়-প্রকাশের জন্যে এর বেশী বাক্য বের হয় না।

আমি কি বলেছি যে তুমি কচি ছেলে? গোবরার পাল্টা প্রশ্ন।

ছেলেই নই তো, তার কচিই কি আর কাঁচাই কি? তবে হ্যাঁ, ছেলের দাদা বলতে পারিস্ বটে। এবার তিনি অকুতোভয়েই গোঁফকে হস্তগত করেন—অবলীলাক্রমে পাক দিতে থাকেন পুনরায়।

ছেলের দাদা—তার মানে? অর্থ খুঁজে পায় না গোবরা।

তার মানে, বাইশ বছর বয়েস হয়ে গেল, এখনো গোঁফ বেরুল না তোর? কত ছেলেরই বেরিয়ে যায় এর চেয়ে ঢের ছোটতেই!

হ্যাঁ! তুই একটা ছেলেরও অধম! তোকে মেয়ের মধ্যেও গণ্য করা যায় না। গোবরাকে একটা নাতনির মতই মনে হতে থাকে তাঁর। কিম্বা তাও মনে হয় না।

নিজে কী, তাই ঠিক করতে পারছেন না—হুঁঃ—। গোবরা গজরায়, ভারী আমার ছেলের দাদা এসেছেন! ভারী!

ভাল করে গোঁফ কামা হু'বেলা— হর্ষবর্ধন সদুপদেশ দ্যান: তবে যদি পদবাচ্য হতে পারিস। এখনো তুই নিতান্তই বালক। আস্ত একটা দুগ্ধপোষ্য। হাসি ধরেনা হর্ষবর্ধনের।

আমি—আমি—আমি বালক? গোবরার রাগ হতে থাকে।

আহা, বালক যদি নাই হতে চাস্, নাবালক তো নিশ্চয়? তাতে তো আর ভুল নেই? দাদু-সুলভ সান্ত্বনার স্বর তাঁর কণ্ঠে।

তুমি তাহলে, তুমি তাহলে—দাদার উপযুক্ত যথোচিত একটা বিশেষণ—তাতে অর্থই হোক্ বা অনর্থই হোক্—খুঁজে বার করার চেষ্টা করে গোবরা—তুমি তাহলে আস্ত একটা মূঢ়মতি!

ঠিক এমনি সময়ে দরজা ঠেলে অপরিচিত একজন প্রবেশ করে যার বালকত্ব সম্বন্ধে হু'ভাইয়ের মধ্যে মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা অতি বিরল।

কাকে চাও হে ছোক্‌রা? হর্ষবর্ধনের তলব হয়।

ঘরে ঢুকেই থতমত খেয়ে যায় ছেলেটা, থমকে যায় যেন: আপনাদেরই। আপনাদেরকেই বোধ হয়: থেমে থেমে বলে।

আমাদের? হর্ষবর্ধন অবাক—আমরা তো চিনি না তোমাকে?

চিনবেন। ক্রমশঃ চিনতে পারবেন।

নাম কি তোমার? গোবরার জেরা চলে।

বিটকেলদের বাঁটকুল! সহজ সুরেই জবাব আসে।

গোবরাকে ধাক্কা মারে যেন। বাব্বাঃ কী বিদ্‌ঘুটে নাম!

কী মতলবে আসা, জানতে পারি? হর্ষবর্ধন জিজ্ঞেস করেন।

আলাপ করতে এলাম। ছেলেটি বলে—আসতে কি নেই?

না, না তা কেন? হর্ষবর্ধন ঈষৎ অপ্রস্তুত হন—আসবে বই কি। তা—তোমরা বুঝি পাশের বাড়ীর?

প্রায় পাশাপাশি বই কি! আপনারাই কি আসাম থেকে এসেছেন? আসামের জঙ্গল থেকে?

হ্যাঁ, সেখানে আমাদের কাঠের ব্যবসা। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলেন।

গোবর্ধনেরও হৃদয়ে আঘাত লাগে, জঙ্গল থেকে বটে, তবে জংলী নই। কলকাতার মানুষের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নই আমরা।

তাইত শুনেছি। কিন্তু হঠাৎ ঢুকে হকচকিয়ে গেছলাম। ছেলেটি প্রকাশ করে—দেখে তো বড়লোক বলে মনে হয় না আপনাদের। বড়মানুষির কিচ্ছু নেই।

বড়লোক নিয়ে তো কথা হচ্ছিল না, কথা হচ্ছিল বড়ো বালক নিয়ে—হর্ষবর্ধন প্রাঞ্জল করতে চান—এই গোবরাটা আমাদের ভারী নাবালক এখনো।

তুমি থামো দাদা! ফোঁস করে ওঠে গোবর্ধন। আসল বালকের সম্মুখে নাবালক বিবেচিত হয়ে নিজেকে ভেজাল প্রমাণিত করতে সে নারাজ।

ওঁদের ব্যক্তিগত সমস্যায় বাঁটকুল কর্ণপাত করে না। বলে, আপনাদের কি খুব টাকা? শুনেছি কিনা, জিজ্ঞেস করছি তাই।

তা টাকা আমাদের অগাধ। হর্ষবর্ধন বলেন অবহেলার সঙ্গে।

অঢেল—অঢেল! কথাবার্তার মোড় ঘোরাতে খুসিই হয় গোবরা —টাকা আমরা ঢেলার মতই মনে করি।

বাঁটকুলের দু'চোখ টোপা কুলের মত হয়ে ওঠে—য়্যা—তো টা—কা?

তা হবে না ? জায়গাটা যে আসাম্। হর্ষবর্ধনের জিজ্ঞাস্য হয় হঠাৎ : আর, টাকাকে ইংরাজীতে কী বলে শুনি ? কী বলে হে ?

আকস্মিকভাবে প্রশ্নপত্রের সম্মুখীন হয়ে ভড়কে যায় বাঁটকুল। ভয়ে ভয়ে বলে, মণি ?

মণি ? মণি কেন ? একি সাপের মাথার, যে মণি ? মানুষ মাথা খেলিয়ে তবে আসে টাকা। টাকার ইংরাজী জানো না ? সাম্ অব রুপিজ—! কত রসিদই সই করে দিলাম ওই বলে। রিসিভড্ দি সাম্ অব রুপিজ—

সাম্ অফ রুপিজ, তো কী হয়েছে ? গোবরাও ঠিক বুঝতে পারে না দাদার বক্তব্য। অনর্থক অর্থনৈতিক আলোচনা একান্ত বিড়ম্বনা বলেই তার বোধ হয়।

এ সাম্ অফ রুপিজ থেকে এলো আসাম্ অফ রুপিজ। হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দ্যান্—আসাম্ হোলো গে টাকার জায়গা। অর্থাৎ কিনা—!

আপনারা বহুৎ টাকা জমিয়েছেন তাহলে ? বাঁটকুল বলে।

আমরা কি আর জমিয়েছি ! এমনিতেই জমে গেছে। জায়গাটাই ভারি জমাটি। হর্ষবর্ধন জানান।

ওখানকার মাটির দোষ ! গোবরার বদনেও বিরক্তির ব্যঞ্জনা।

জল যেমন জমে যায়, আপনা থেকেই, তেমনি টাকা জমে আসামে। হর্ষবর্ধন দুঃখ করেন—না জমিয়ে নিস্তার কি !

জমাতেই হবে, উপায় নেই ! মহা মুস্কিল ! হাল ছেড়ে দিয়ে গোবরা হতাশ ! একদম।

আপনা আপনিই জমে যায় টাকা ? ভাবতে গিয়ে বাঁটকুলও নাজেহাল হয়ে পড়ে।

এই ধরো, এই রকমে—জমনীয়তার রহস্যকে ধীরে ধীরে

উদ্‌ঘাটিত করেন তিনি ঃ জলে এসে জল বাধে, তার ওপরে ঠাণ্ডা পড়ে, অম্‌নি জল জমে বরোফ ! কেমন কিনা ? তেমনি টাকায় এসে টাকা বাধে, তার ওপরে ছাতা পড়ে, অমনি টাকা জমে—টাকা জমে—? উপযোগী শব্দের জন্য তিনি উপযুক্ত ভ্রাতার মুখের দিকে তাকান।

টাকা জমে পাহাড় ! কথা যোগাতে দেরি হয় না গোবরার !

পা—হা—ড় ! য়্যা—তো—টা—কা ! বিস্ময়ে হাঁ বুজতে চায় না বাঁটুকুলের !

তা পাহাড় বই কি ! পাহারা দিতে হয় না—কেউ নিয়ে পালাবে, সে ভয় নেই। পাহাড়ই বলতে হবে—ছোটখাটো পাহাড় কিম্বা পাহাড়ের অপভ্রংশ।

খরচ হবার যো কি ! গোবরা বলে—সহজ নয় অত !

একটা চোর ছ্যাঁচোড় নেই সেখানে, যে নিয়ে পালাবে। হর্ষবর্ধন বেজায় ক্ষুব্ধ।

গরীব ভিখিরী নেই যে দিয়ে পালাব ! গোবরাও ভারী বেজার।

তা হলে ঠিক জায়গাতেই পৌঁচেছি। বলে বাঁটুকুল, প্রথমে ভেবেছিলাম যে ভুল ঠিকানা ! ভালো কথা, আপনাদের কাছে রিভল্‌ভার আছে ?

রিভল্‌ভার ! সে আবার কী ?

এই পিস্তল্ বলে যাকে।

নাঃ, নেই ! হর্ষবর্ধনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে কি হবে তা দিয়ে ?

বন্দুক—টন্দুক ?

বন্দুক কেন থাকবে ? বিস্মিত হন তিনি—ও কি কাছে রাখবার জিনিস ? ওর থেকে গুলি বেরিয়ে যায় যে !

আমরা তো আর গুলিখোর নই ! গোবরা বলে, যে রাখতে যাব ও-সব।

ছোরা-টোরা ? তাও নেই ?

এতক্ষণে গোবরার যেন কেমন ঠ্যাকে—সন্দেহের ছায়াপাত হয়। এমন কি লাট হে তুমি যে এত কৈফিয়ৎ দিতে যাব তোমায় ?

লাট নই সত্যি, তবে অনেককে লাট বানিয়ে দিই বটে! মুচকি হেসে বলে বাঁটকুল।

তোমরা লাট বানাও ? বটে ? গোবরা মুখ ব্যাঁকায়—একদম বাজে কথা। আমি বিশ্বেস করিনা। আল্‌বাৎ !

বল্লেই হোলো ! বিলেত থেকে আমদানি হয় লাট ! হর্ষবর্ধন সায় দ্যান—হ্যাঁ, লাট আর কারুকে বানাতে হয় না এখানে।

লাট কি চারটিখানি ? গোবরা পুনশ্চ যোগ করে—বানিয়ে দিলেই হোলো !

বলুন না কেন, আপনাকেই বানিয়ে দেব এক্ষুনি। বাঁটকুলেরও জোরালো জবাব : আকচারই বানাচ্ছি কত !

আকচারই বানাচ্ছ ! বটে !

হর্ষবর্ধনের হয়তো একটু বিশ্বাসই হয় এবার, ঈষৎ প্রলুব্ধই তিনি হন : লাট করা তো সোজা নয়—কী করে করবে শুনি ?

মেরেই লাট করে দেব। ছেলেটি বলে—হতে চান আপনি ? বলুন তা হলে।

হর্ষবর্ধনের উৎসাহ হয় না। হাত-পা ভেঙে অপদস্থ হয়ে উচ্চপদস্থ হবার উচ্চাকাঙ্খা তাঁর নেই, অন্ততঃ ততটা তীব্রভাবে নেই। তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। গোবরাও ঘাড় নাড়ে। চাকরি পাবার আগেই সে রিজাইন দিয়ে দ্যায়।

তবে যা যা জিজ্ঞেস করি, ভালো ছেলের মত জবাব দিন তা হলে। বুঝলেন ? হ্যাঁ। আচ্ছা, টেলিফোন আছে এই বাড়ীতে ? নেই ? ভালো কথা। বেশ, তবে এই চিঠিটা নিন আপনাদের।

বাঁটুকুল একটা চিঠি বাড়িয়ে ছায়।

এবার গোবরার সন্দেহ হর্ষবর্ধনের অন্তরেও সঞ্চারিত হয়—একই সংক্রামক আশঙ্কা দুজনের মনেই ঘনীভূত হতে থাকে। লাট হবার বা ঐ জাতীয় ভয়াবহ কিছু হবার আমন্ত্রণপত্র নয় তো! কম্পিত হস্তে তিনি খাম খোলেন।

চিঠির মর্ম ভারী মর্মন্তুদ্—পড়ে মর্ম ভেদ করে মুখ শুকিয়ে যায় হর্ষবর্ধনের। কয়েকটি আঁচড়ে জানানো হয়েছে :

"পত্রপাঠ মাত্র পত্রবাহকের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা গুণে দেবেন। নতুবা আপনাকে পাকৃড়ে ধরে এনে আমাদের আটক্‌ঘরে আঁক্‌ড়ে রেখে দেব, যদ্দিন না আদায় হবে টাকাটা। ইতি—

শ্রীবিটকেল সম্রাট।

নাঃ, লাট করবার ষড়যন্ত্র নয় বটে, কিন্তু তার চেয়েও কিছু কম শোচনীয় নয়। গোবরার হাতে তিনি এগিয়ে ছান সম্রাটের চিঠিটা।

গোবর্ধন পড়ে গম্ভীর হয়ে যায়—তখন যা বলছিলাম দাদা!

আজকের আনন্দবাজারের—সেই নিরানন্দকর সংবাদের সঙ্গে যে এর ঘোরতর সংস্রব আছে বলবার আগেই তা টের পেয়েছেন হর্ষবর্ধন। তিনি শুধু বলেন, টাকা দিয়ে পাপ চুকিয়ে দাও। কাজ নেই হাঙ্গামে।

কিন্তু ছেলেটা গেল কোথা? এঘর, ওঘর, ওপর-নীচ, চারিধার খোঁজা হোলো, পাত্তাই নেই। দলবল ডেকে আনতে গেল নাকি?

হর্ষবর্ধনের বুক দুর্ দুর্ করে—ছেলেধরারা এসে পৌঁছবার আগেই, বুঝেচিস্ গোবরা—বিদূরিত হবার বাসনা জাগতে থাকে তাঁর মনে : পালাই চ এখান থেকে।

এক্ষুনি চলো দাদা। গোবরাও নিজেকে দূরীভূত করতে চায় : সুদূরে পালিয়ে যাই।

একবস্ত্রে দু'ভাই বেরিয়ে আসে বাড়ী থেকে। কাঁপতে কাঁপতে, কোনোরকমে তালা আঁটে সদর দরজায়। তারপরে ফুটপাথে পদক্ষেপ করে।
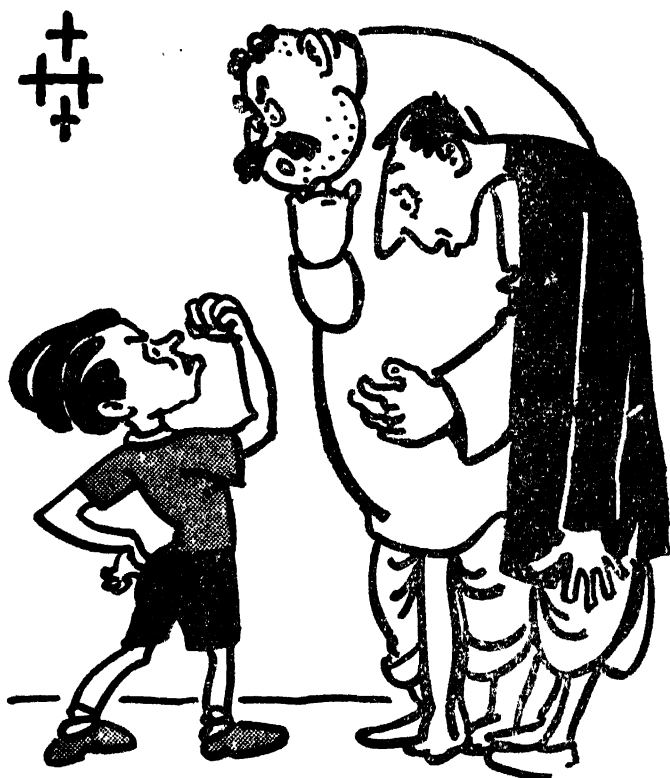
মেরেই লাট করে দেবো—

কয়েক পা এগুতেই দেখতে পেল প্রকাণ্ড একটা ধূসর রঙের মোটার দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোবরা সেইদিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ

করে ঃ হেঁটে আর কতটা পালানো যাবে ? চলো ওই মোটারে করে কেটে পড়ি।

হর্ষবর্ধন একখানা একশ টাকার নোট গুঁজে ছান ড্রাইভারের হাতে ঃ এখান থেকে পালিয়ে চলো। নিয়ে চলো আমাদের যেখানে ইচ্ছে যেদেশে ইচ্ছে যতদূরে ইচ্ছে—এই নাও তোমার ভাড়া এই একশ টাকা। একশ মাইল গিয়ে তবে থামবে। বুঝেচ ?

বাবাঃ ! এ ছেলেধরার দেশে আর না ! গোবরা বলে, কলকাতায় থাকে মানুষ ? ছ্যা ! কখনো আসতে আছে এখানে ? দূর্ দূর্।

॥ তিন ॥

তুমি ভুল করো না পথিক !!

ষ্টার্ট দিয়ে গাড়ীটাকে চালু করেই ড্রাইভারের প্রশ্ন হয় : কোন দিকে যাবো, মশাই ?

যেদিকে খুসি ! বৈরাগ্য-বিমুখ জবাব বড় দাদার : যেদিকে তোমার মোটার যায় !

চালাও দিগ্বিদিকে। ছোটো ভাইয়েরও হাল ছেড়ে দেবার বিলাসিতা ! বলে, কলকাতা ছেড়ে যেদিকে দিল্ চায় তোমার।

ইটালীর দিকে যাবো কি ? ড্রাইভারের পুনশ্চ জিজ্ঞাস্য।

ইটালী ! আকাশ থেকে পড়েন হর্ষবর্ধন : মোটারে চড়েও যাওয়া যায় না কি সেখানে ? য়্যাঁ ? এ বলে কি রে গোবরা ?

কিন্তু ড্রাইভারের মুখে পরিহাসের কোনো লক্ষণ না দেখে তিনি নিজেকে সামলে নেন : হবেও বা ! আমরা কিন্তু উড়োজাহাজে চেপেই গেছলুম যেন একবার ! সে তো এখানে নয়, অনেক দূর যে —প্রায় বিলেতের কাছেই বলতে গেলে !

আবার সেখানে যাবে নাকি দাদা ?

আবার ? পাগল হয়েছিস ? ছ্যাঃ ! আবার সেখানে যায় মানুষ ? সেই ইটালীতে ? দুবার যায় সেখানে ? রামোঃ !

কোনো জায়গায় দু'বার যাওয়া গোবরারও মনঃপুত নয়—যদি এক জায়গার মধ্যেই বারম্বার ঘুরবে তাহলে ভগবান মরতে এত জায়গা সৃষ্টি করতে গেলেন কেন ? এই সুবিস্তৃত ভৌগোলিক

উপন্যাস—এই লীলায়িত বিলাসিতা—কত দেশ আর শহর, পাহাড় আর পাড়াগাঁ, অরণ্য আর লোকারণ্য, এসব তৈরি করতে তাঁকে তো কম বেগ পেতে হয়নি, কষ্টও বেশ করতে হয়েছে, দস্তুর মতই! কেন না গোবরার ধারণা (এমন কি তার গবেষণাও বলতে পারো) যে লোনা সমুদ্রগুলো অনেক সৃষ্টি এবং অনাসৃষ্টির মেহনতে হায়রান পরমেশ্বরের বিস্তর অশ্রুপাত ছাড়া আর কিছু না।

ইটালী ছাড়া আর কোথাও কি যেতে পারো না তুমি? এই ধরো—কিয়ৎক্ষণ মাথা ঘামাতেই ভূগোলের গোলমাল পরিষ্কার হয়ে আসে; গোবরার মনে পড়ে যায়ঃ ডেন্‌মার্ক?

পদ্মপুকুরেও যেতে পারি। গম্ভীর মুখে জবাব দ্যায় ড্রাইভারঃ কিম্বা বলেন তো বালিগঞ্জে, কি আরেকটু এগিয়ে আলিপুরে—

ঈষৎ কিন্তু বিশদ বাঁকা হাসিই যেন দেখা যায় তার মুখে।

আহা, চালিয়ে চলো তো তুমি! দেখাই যাক্ না কদ্দূর যাওয়া যায়! হর্ষবর্ধন গন্তব্যসমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করে দ্যান এক কথায়।

হ্যাঁ দেখাই যাক্ না কোথায় যাই! গোবরাও উৎসাহ দেখায়ঃ বিলেতেই যাই কি খালেতেই যাই। একশ মাইলের ভাড়া তো দেয়াই রয়েছে তোমার! ভয় কি?

কেবল ঐ লক্কড় ইটালিটা বাদ দিয়ো বাপু! নেহাৎ না পারো ওটার পাশ কাটিয়ে যেয়ো বরং! এবং—হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েনঃ এবং তোমার ঐ আলীপুরটাও আমার খুব ভালো ঠেকছে না হে। নাম শুনেই সন্দেহ হচ্ছে কেমন!

গাড়ী চলতে থাকে। এ রাস্তা ঘুরে ও রাস্তায় বেঁকে সে রাস্তার ভেতর দিয়ে শট্‌কাট্‌ করে, কখনো ক্ষিপ্র বেগে, কখনো বা ধীর মন্থর গমনে, বহুৎ য়্যাক্‌সিডেণ্ট থেকে বেঁচে এবং দেদার ধাক্কা বাঁচিয়ে চলতে থাকে গাড়ী। এন্‌তার ঠোকাঠুকির মুখোমুখি এগিয়ে, এমন

কি অনিবার্য সামনে এসে কি করে যে সামলে নেয় ; নিজে চুরমার না হয়ে এবং কাউকে বিচূর্ণিত না করে কি করে যে বেমালুম বেরিয়ে যায় সেই এক রহস্য ! ড্রাইভারের ওস্তাদি দেখে বাহবা দিতেই ইচ্ছে করে ওঁদের। এবং নিজেদের জোর বরাতকেও তারিফ করতে হয়। রুদ্ধ নিশ্বাসেই করতে হয়।

অবশেষে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যায় গাড়ী। ট্রাম ট্যাক্সি গোরুর গাড়ী রিক্শ লরী—সব সেখানে দাঁড়ানো। রাস্তা জাম্। এত ভিড় কেন রে বাপু এ রাস্তায় ? এত পথ পেরিয়ে এলেন—মোটারে চেপেও এতখানি সবুর করতে হবে এমন কথা তো ছিল না কোথাও !

রাস্তাটার নাম কি হে ড্রাইভার ?

ষ্ট্র্যাণ্ড রোড।

তখনি বুঝেছি আমি। হর্ষবর্ধন বলেন সহর্ষে: ইস্ট্যাণ্ডো মানে জানিস তো গোবরা ? ইস্ট্যাণ্ডো মানে দাঁড়ানো। না, ভুলে মেরে দিয়েছিস একেবারে ?

জানি জানি ! ভুলব কেন ? ইস্ট্যাণ্ড আপন দি বেঞ্চ। গোবরা যে ভুলে মেরে ছায়নি জোরালো গলা জাহির করে এবং আনুষঙ্গিক উদাহরণ যুগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সপ্রমাণ করে। বাস্তবিক, ভুলবার কথা তো নয় ! পড়াশুনায় যতই কাঁচা হোক, ইস্ট্যাণ্ডোর কথা যে ভোলা যায় না কিছুতেই। বরং, কাঁচা হবার জন্যেই, আরো বেশী করেই স্মরণে আছে বিশেষ করে ঐটাই। কেবলমাত্র বইয়ের পড়া বলেই নয় ইতিহাসের বিষয়ও যে বটে ওটা—কতবারই না উক্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে তাঁদের বাল্যজীবনে। তার স্মৃতি কি ভুলবার ? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং স্বয়ং দৃষ্টান্তস্থল হয়ে যা শেখা যায় তা কি হজম করবার জিনিস ?

সেইজন্যেই গাড়ীঘোড়া সব দাঁড়িয়ে! ইস্ট্যাণ্ডো রোড যে। হর্ষবর্ধনের অভিযোগ : এখানে দাঁড়াতেই হবে কি না! ইস্ট্যাণ্ডো রোড বলেছে কেন? অনির্বচনীয় তাঁর হাসি।

আর ঐ যে দূরে, দেখছ দাদা!—আন্দাজ করেই বলে গোবরা : ঐ হচ্ছে হাওড়ার পুল! নিশ্চয়ই ভাই, তা ছাড়া আর কি হবে? তাছাড়া আর পুল আছে কি কলকাতায়? বইয়েও পড়া গেছে আর সনাতন খুড়োও বলেছিল! হাওড়ার পুল জলে ভাসে, জানো তো দাদা?

গোবর্ধন যেন দাদার আবিষ্কৃত উক্ত দণ্ডায়মান রাস্তার চেয়েও বৃহত্তর পরমাশ্চর্যকে বহিষ্কার করে।

হর্ষবর্ধন গুম্ হয়ে যান। আপ্যায়িত হওয়া তার পোষায় না। ইতিহাসেরই কি আর ভূগোলেরই কি, দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিদ্যা প্রকাশের বাহাদুরি, এইভাবে সব তাতেই দাদার ওপর টেক্কা মারবার দুশ্চেষ্টাকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। খুড়ো নয়, জ্যাঠা নয়, পিসে নয়, পিস্‌শ্বশুরও না, সামান্যমাত্র একটা ভাই হয়ে অগ্রজকে এককাঠি ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সব সময়েই এই যে ওৎ পেতে থাকা—এটা তাঁর অত্যন্ত অশোভন মনে হয়। মিলিয়ে মিশিয়ে সমস্তটা বরদাস্ত করা কঠিনই হয় তাঁর পক্ষে। বেজায়রকম তিনি ব্যাজার হন; হাজার কৌতূহল থাকলেও, পুলের প্রতি ভুলেও দৃকপাত করেন না, ভ্রূক্ষেপই করেন না সেদিকে, বলতে গেলে।

গাড়ীও অচিরে মোড় ঘুরেছে, এবং তিনিও, ভাসমান পরমহংস-জাতীয়, দেব-দুর্লভ বস্তু দেখবার দুরভিসন্ধি অতিকষ্টে দমন করে ফেলেছেন ততক্ষণে। গোবরার কথায় কান না দিয়ে ড্রাইভারকে তিনি জিজ্ঞেস করেন : আর এ-রাস্তাটার নাম?

হ্যারিসন রোড।

হ্যারিসন? সে আবার কি? এরকম অদ্ভুত নাম কেন? হর্ষবর্ধনের মাথা ঘুরে যায়ঃ আমাদের বাড়ী রসা রোডে। একটা মানে হয় তার। অর্থাৎ কিনা রসায়ন রোড, সংক্ষেপে রসা। অর্থাৎ কিনা যত রসিক লোকের বসবাস সেখানে। কিন্তু এ-রাস্তায় নাম এরকম বেধড়ক হ্যারিসন হতে গেল কেন?

বড়বাজার কিনা এখানে! ড্রাইভারের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

উঁহু, তা নয়। হর্ষবর্ধন স্বয়ং টীকা করেনঃ এটা হরি সেন রোড। হরী সেন হোলো গে গৌরী সেনের ভায়রা ভাই। নামজাদা সেই গৌরী সেন, সেই যে উড়িয়ে-ফতুর লোকটা, সবাইকে টাকা নেবার জন্যে সাধাসাধি করে বেড়াত হে!

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, কথাতেই বলেছে! গোবর্ধন ভাষ্য করেঃ আমাদের সেই গৌরী সেন গো। ব্যাখ্যার ব্যাখ্যানায় বিলক্ষণ ওস্তাদ—সর্বদা তৎপর গোবর্ধন।

গৌরী সেন কোথায় থাকত কে জানে। কিন্তু পাছে টাকা নিতে হয়, ভায়রা ভাই এসে জবরদস্তি করে সজোরে গছিয়ে দিয়ে যায় সেই ভয়ে হরি সেন বেচারীকে য়্যাদ্দূরে পালিয়ে এসে থাকতে হয়েছিল।

হর্ষবর্ধনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। ভয়াবহ টাকার জন্যে—তার ছোঁয়াচ বাঁচাতে, আত্মরক্ষার উপলক্ষে, কী না করে মানুষ?

ততক্ষণে গাড়ী আরো খানিক এগিয়ে আরেকটা বাঁক নিয়েছে।

এটা কি রাস্তা?

আজ্ঞে, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

সেরেফ গোঁজামিল দিচ্ছ কেবল? য়্যাদ্দিন্ ধরে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছ, রাস্তাঘাটের নামগুলোও ভালো করে জানো না বাপু! আওয়াজ শুনলেইত টের পাওয়া যায়! বেশ বোঝা যায় যে এটা কর্ণওয়ালিশ নয়, কর্ণ-বালিশ। মহাভারতের কর্ণের বালিশ থাকত এখানে।

কান-বালিশও তো হতে পারে দাদা। গোবর্ধনও নিশ্চেষ্ট থাকবার পাত্র নয়।

হ্যাঁ, তাও পারে। তাও হতে পারে বটে। তা হলে কিন্তু পাশ-বালিশও থাকবে। থাকতেই হবে। পাশবালিশের রাস্তাটা কোন্ ধারে তবে? ড্রাইভারের কাছেই তাঁর পথের দাবী।

বেচারা কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে ভাবে, তারপরে হতাশভাবে ঘাড় নাড়ে। ওই নামের কোনো রাস্তা চোখে পড়া দূরে থাক, তার কানের সীমান্তেও কখনো এসেছে কিনা সন্দেহ হয়।

আমরা যাচ্ছি কোনদিকে? গোবর্ধন জিজ্ঞেস করে। সামনের দিকটাতেই পাশবালিশের অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে তার আশঙ্কা!

শ্যামবাজারের দিকে।

তাহলে ঠিকই হয়েছে। কানবালিশ নয়, কর্ণবালিশই তবে হবে এটা। হর্ষবধন উল্লসিত হন। এখানেই কর্ণ এবং সামনেই শ্যামচাঁদ—তারপর আরো খানিক এগুলেই নিশ্চয়ই কুরুক্ষেত্র পাবো। হর্ষবর্ধনের হর্ষ আরো বর্ধিত হয়।

আর এরই আশেপাশে—বুঝলে কিনা দাদা? প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় গোবরাই কি পেছোবার ছেলে। এরই আশেপাশে এধারে ওধারে আছে দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য, ধনঞ্জয়, নল, নীল আর গয়-গবাক্ষ। একেবারে জলজ্যান্ত মহাভারতে এসে পড়া গেছে দাদা!

মহভারতের কিস্‌কিন্ধ্যা কাণ্ডে। যা বলেছিস্ ভাই!

নল তো চারধারেই। রাস্তার তলাতেও আবার! ড্রাইভার সায় না দিয়ে পারে না। এই যে বাড়ী বাড়ী জলের কল, এসব জল আসছে কোত্থেকে বলুনত। ঐ নল থেকেই সব। রাস্তার তলা দিয়ে নল। কিন্তু ফাটলে কি আর রক্ষে আছে? একবার নল ফেটে কী জলটাই জমেছিল রাস্তায়। ঐ রাস্তাতেই—আজ্ঞে!

বটে বটে ? হর্ষবর্ধন একটু সন্ত্রস্ত হয়। তা হলে গাড়ী ঘুরিয়ে নাও তুমি। কুরুক্ষেত্রের কিস্‌কিন্ধ্যা কাণ্ডে গিয়ে আর তবে কাজ নেই। আমাদের লঙ্কাকাণ্ডই ভালো।

গাড়ী দিক্ পরিবর্তন করে। খানিক পরে ড্রাইভার নিজে থেকেই জানায়—এটা কলেজ স্ট্রীট।

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন—কেন ? লেজ কেন ?

বলতে পারব না মশাই ! বলেই পরক্ষণেই তার টনক নড়ে। রামায়ণের হনুমানের সঙ্গে এই লেজের অঙ্গীভূত কোনো অচ্ছেদ্য যোগাযোগ আছে কিনা, হর্ষবর্ধন সাগ্রহে এই প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে ড্রাইভারের মনে পড়ে যায়, বিশ্ববিদ্যালয় আছে কিনা এই পাড়ায় ! সেখান থেকে লেজ বিতরণ করে, বোধহয় সেইজন্যেই !

ইনফ্যাণ্ট ক্লাসে ভর্তি হওয়া থেকে সুরু করে ফিফ্‌থ ক্লাস অবধি পাঁচবার, ফোর্থক্লাসে তিনবার, থার্ডক্লাসে চারবার, সেকেণ্ডক্লাসে সাত-বার এবং ফার্ষ্ট ক্লাসে আঠারোবার—সবশুদ্ধ, আদি থেকে ইতি পর্যন্ত ইত্যাদি জড়িয়ে, সাঁইত্রিশবার মোটমাট ফেল্ গিয়ে, শেষটায় নিজের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে অন্যায় রকমে ঘন ঘন প্রোমোশন পেয়ে প্রায় ধরে ফেল্লে দেখে, অবশেষে, গোঁফে পাক ধরবার সঙ্গে, ইস্কুলে ইস্তফা এবং ম্যাট্রিক পাশের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, ষ্টিয়ারিং হুইলের পাশে এসেছে। কাজেই ডিগ্রীধারীদের উপর খুব স্বাভাবিক এবং ন্যায়-সঙ্গতই বিরাগ ছিল ড্রাইভারের। এমন কি, বিজাতীয় ক্রোধই বলা যেতে পারে তাকে। পাশকরাদের আদৌ মানুষের মধ্যেই তার মনে হ'ত না, একেবারেই ধর্তব্যের বাইরে, নগণ্য এবং জঘন্য সে সব লোক, বাস্তবিক ! আন্তরিক উষ্মা সে আর উহ্য রাখতে পারে না—মনের কথা ব্যক্ত করেই বসে !

বিশ্ববিদ্যালয় আবার কী বস্তু, তার সম্যক রহস্য অবগত হতে

যাবেন এমন সময়ে বেমক্কা আওয়াজে মোটারের একটা টায়ার ফেটে, গাড়ী থেমে যায় হঠাৎ। আচমকা পথের মধ্যে।

বোমা ফাটল যেন! ভারী ঘাবড়ে যান হর্ষবর্ধন, কে ছুঁড়ল বোমা? ছেলেধরারা নাকিরে?

বেঁচে আছি তো দাদা? গোবরা নিজেকে চিম্‌টি কেটে ছাখে। নিজেকে কাটিতে গিয়ে দাদাকে চিম্‌টি কেটে বসে।

উঁহু, বোমা না। পটকাও না! কিন্তু অনেক হাঙ্গামা! এই বলে মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন করে ড্রাইভার গাড়ী থেকে নামে।

টায়ার বদলানো বেশ কিছুক্ষণের ধাক্কা জেনে নিয়ে হর্ষবর্ধনও গাড়ীকে তালাক্ ছান। গোবরাও নেমে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে বাবু হয়ে বসে থেকে গা জড়িয়ে এসেছিল, কাবু হবার দাখিলই প্রায় —হাত পা এই অবসরে একটু খেলিয়ে নেওয়া দরকার।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে করে অরুচি ধরে যায় হর্ষবর্ধনের। হঠাৎ তিনি প্রস্তাব করে বসেন, জীবে দয়া করলে কেমন হয়? তাই করা যাক্। আয়!

জীবে দয়া—তার মানে? জীবে দয়া অর্থাৎ রসগোল্লা, সন্দেশ, মেঠাই, মণ্ডা, মতিচুর!

তা তো বুঝেছি। কিন্তু জীব কোথায়? গোবর্ধন চারিধার তাকিয়ে, সূচীভেদ্যভাবে দৃষ্টি চালিয়েও জীব-পদবাচ্য এবং দয়ার যোগ্য, একটা কাঙাল কি ভিখারী, সাধু কি সন্ন্যাসী, এমন কি লালায়িত একটা ছাগল কি গরু পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে না। একটা পথভ্রান্ত নেড়ি কুত্তাও চোখে পড়ে না।

দয়া যে করবে তা জীব কই তোমার?

কেন, এই যে জীব! এইখানেই রয়েছে। মৃদুহাস্য করে বলেন হর্ষবর্ধন, যাবতীয় জীব আমার মুখের মধ্যেই আছে।

হর্ষবর্ধন বদন ব্যাদান করে তার ভেতর থেকে বিচালিত জীবকে বাইরে আনেন, এটা কি জীব নয় ? কী তবে শুনি এটা ?
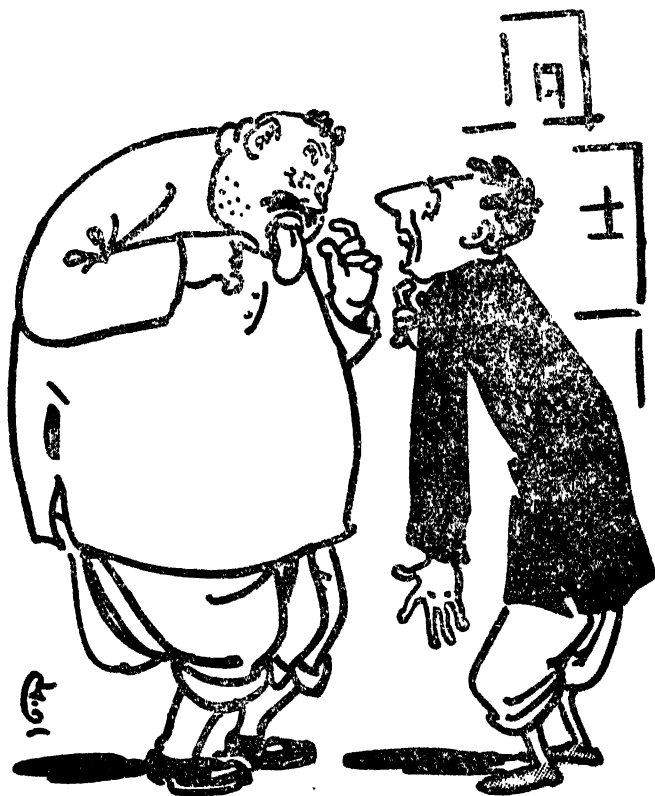
দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমান সব্যসাচীকে, স্বয়ং হাঁ করে যে প্রদর্শনী দেখিয়েছিলেন—সে যুগের ওয়ার্লড এগজিবিশান্ আর কি ! এবং অর্জুনকেও হাঁ করিয়ে, এমন কি তাকে একেবারে থ করে দিয়েছিলেন বলতে গেলে—তারই পুনরাভিনয় বা তেমনি রোমাঞ্চকর কোনো দৈবী-লীলা দেখতে পাবে, হয়ত এহেন প্রত্যাশা

গোবরার ছিল—কিন্তু যাবতীয় জীবের বদলে একমাত্র এবং একমাত্রা কিম্ভূত কিমাকার ঐ বস্তু—এই দুর্ঘটনা দেখে কেবল ক্ষুণ্ণই নয় বিরক্তও হয় সে—ওঃ, এই জীব !

দাদার লেলিহান বাবা-কালী মূর্তিও তার ভাল লাগে না।

কিন্তু প্রস্তাবের কাছাকাছিই জীবে দয়ার ব্যবস্থা দেখলে কার না উৎসাহ হয় ? লোভের সামনে ক্ষোভ আর কতক্ষণ থাকে ? মোটার বেগড়ানোর সামনেটাতেই জমকালো একটা সন্দেশের দোকান তাদের চোখে পড়ে।

এমন উপাদেয় জিনিস তারা কোথ্থাও খায়নি—না নিজের দেশে, না কলকাতায়। জীবে দয়ার উপযুক্তই বটে ! উল্লাসের আতিশয্যে গোবরা উন্মুখর হয়ে ওঠে, বাঃ বাঃ ! তোফা জিনিস তো ! কেবল দয়া কেন, জীবে ভালবাসাও বলতে পারা যায়, কি বল দাদা ?

হবে না ? বলেন কি মশাই ? ভীম নাগের যে ! দোকানী জানাতে দ্বিধা করে না।

য়্যাঁ, ভীম—কি বললে ? হর্ষবর্ধন তো লাফিয়ে উঠলেন।

ঐ দেখুন না সাইনবোর্ডেই দেখতে পাবেন। এটা হচ্ছে আসল ভীমের দোকান। আর পাশেই ঐ তস্য ভ্রাতার।

তাইত, সত্যিই তো ! দু'ভায়ের তাক্ লেগে গেছে, চোখ উঠে গেছে কপালে। বহুক্ষণ বাদে হর্ষবর্ধন আগে সবাক্ হয়েছেন : দেখেছিস্ ! ভীমার্জুন তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে কিন্তু তাদের দোকান রয়েছে এখনো। মহাভারতকে মিথ্যে বলবি আর ? চোখের সামনেই জাজ্জ্বল্যমান ত্যাখ ! পুনরপি বলছেন তিনি : তা ছাড়া এমন চমৎকার মেঠাই আর কার হবে ? স্বয়ং ভীমের বের-করা, আলবৎ ! ভীম ছাড়া আর কারো কম্ম না, আমি হলফ করে বলতে পারি। বৃকোদর একটু পেটুক ছিল, কে না জানে।

যেমন পেটুক ছিল, দাদা, তেমনি খেতেও পারত খুব। হজমও করত বেশ! তা পেটুক হওয়া এমন কি দোষের? ছিল বলেই তো বের করতে পেরেছিল এসব! স্বর্গত ঔদরিকের প্রতি গোবর্ধন তার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে: পেটুক হওয়া ভালই তো! তাতে ক্ষতিই বা কি? খেতে আর খাওয়াতে মজবুত লোকরা মন্দ কি এমন?

ততক্ষণে মোটারটাকে দুরস্ত করে এনেছে ড্রাইভার। তার মাথাও অনেক সাফ হয়ে এসেছে। আরোহীদের এ-পর্যন্ত আলাপ-সালাপ অনুসরণ করে, বিশেষ করে অযাচিতভাবে জীবে দয়া-সমিতির অন্তর্ভূক্ত হয়ে অভাবিত ভাবে ভীম নাগ উদরস্থ করার ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে তার। তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সামনে, কুরুক্ষেত্র আর কলকাতা, রামায়ণ-মহাভারত এবং আনন্দবাজার-বসুমতী একাকার হয়ে দেখা দিয়েছে।

মোটার চলতে থাকে এবং সে বলতে থাকে—নিজে থেকেই বলে যায়: ভীমার্জুন-পাড়া ছাড়িয়ে এলাম তো! আর এই হচ্ছে আপনার ধর্মতলা! ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আস্তানা ছিল এখানে, বুঝেছেন? আর এখানটা চাঁদনি, অর্থাৎ কিনা চন্দ্রলোক, আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এ জায়গাটা এস্‌প্লানেড্‌, বোধহয় ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল এখানে। ...আর এটা হলো গে' ডালহৌসি স্কোয়ার, ভারী কটমট নাম, কী ছিল এখানে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক! হয়তো কিসকিন্ধ্যা হবে। আর এইবার চললুম ক্লাইব ষ্ট্রীট দিয়ে। ক্লাইব? ক্লাইব কে ছিল?

ড্রাইভারের প্রশ্নবাণে আহত হয়ে গোবরা দাদার দিকে তাকায়: কে ছিল দাদা? ক্লাইব কি জটায়ু পক্ষী?

উঁহু। ডালহৌসি আর ক্লাইব এ দুটো বোধহয় মহাভারতের সেই দুটো বিচ্ছিরি লোক! হর্ষবর্ধনের ঈসৎ হাস্যই বেরোয়: আর কেউ না—হিড়িম্বা আর ঘটোৎকচ!

তাই হবে। বলে গোবরা : তাই হবে বুঝলে হে ড্রাইভার! কিন্তু বাপু, তোমাকে বললুম আমরা, কলকাতা থেকে আমাদের বার করে নিয়ে যেতে—একশ টাকা আগাম দিলুম, নগদ—থোক্‌, আর তুমি কিনা—কলকাতার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছ তখন থেকে। কেমন লোক হে তুমি? পঞ্চাশ মাইল তো এইখানেই কাটিয়ে দিলে! কুরুক্ষেত্রই বাধাবে দেখছি শেষে!

এই যে যাই মশাই! দেখতে পাচ্ছেন না সামনেই সেতুবন্ধ রামেশ্বর! এইটা পেরুলেই তো কলকাতার বার।

অপরিচিত হয়েও সুপরিচিত, চির পুরাতন অথচ চির নূতন, আদিম এবং অকৃত্রিম, অদ্বিতীয় সেই হাওড়ার পুলকেই সেতুবন্ধ বলে ভেজাল চালানোর চেষ্টায় হর্ষবর্ধনের রাগ হয়ে যায় : এই সেতুবন্ধ? কিচ্ছু জানো না তুমি। কলকাতায় কিনা সেতুবন্ধ! দূর্‌ দূর্‌!

বোকা পেয়েছ আমাদের? গোবরাও খাপ্পা হয়ে ওঠে : জানি না কিচ্ছু আমরা? বটে?

কেন, থাকতে কি নেই কলকাতায়? ড্রাইভারের আত্মরক্ষার প্রয়াস : এত জিনিস আছে যখন!

তোমার মুণ্ডু আছে! সেতুবন্ধ জলে ভাস্‌ত, তা জানো?

এও তো তাই মশাই! ড্রাইভার এবার স্বপক্ষে একটা পয়েণ্ট পায়। এও ভাসছে যে! তাকিয়ে দেখুন না নীচে!

ভাসতে পারে, কিন্তু সে সেতু বানিয়েছিল বাঁদরে—গোবরা বলে, তুমি কি বলতে চাও যে, বাঁদরের তৈরী?

বাঁদর ছাড়া আর কি! এর পেছনে সব লেজওলা লোক ছিল মশাই, আমি বলে দিতে পারি। ড্রাইভারের জোরালো কবুলতি : দিব্যি গেলেই বলতে পারি। হুঁ।

ড্রাইভার একসঙ্গে দুটো পয়েণ্ট জেতে এবার—একটা নিজের

পক্ষে, আরেকটা যারা তাকে বারম্বার ফেল করিয়েছিল, অদূরদর্শী সেই অবিবেচকদের বিপক্ষে।

হর্ষবর্ধন গম্ভীর হয়ে যান, একটা কথাও বলেন না আর। নেহাৎ ছেলেধরাদের ভয়, নইলে এক্ষুনি তিনি এই অর্বাচীনের গাড়ী থেকে সুড়ুৎ করে নেমে পড়তেন। আগাম দেওয়া ভাড়ার টাকাও তাঁর মুখে লাগাম দিয়ে রাখতে পারত না! এমন নিরক্ষরের মোটারেও আবার মানুষ চাপে?

তাঁর আফশোষ হয়—ছ্যা! বলীরাজা একশ মুখ্যুকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গেও পা বাড়াতে সাহস করেন নি, বরঞ্চ জাহান্নামেই গেছলেন একলা—একটি টুঁ শব্দও না করে। আর তাঁকে কিনা, সেই জাতীয় একটা আকাটের সঙ্গে এক গাড়ীতে চেপে কলকাতার বাইরে পাড়ি দিতে হচ্ছে! দুর্দৈব আর কাকে বলে?

গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে নিঃশব্দে চলে মোটার—কারো মুখেই রা নেই। মৌলিক গবেষণায় ধাক্কা খেয়ে ড্রাইভারও দমে গেছে বেজায়! অবশেষে বালী ব্রীজ এসে পড়ে। আপনা আপনিই আসে।

ড্রাইভারের আমতা আমতা আরম্ভ হয়ঃ আপনারা তো তখন উড়িয়ে দিলেন আমায়! বললেন ওটা সেতুবন্ধ হতে পারে না কখ্খনো? তাহলে এটা কী? এটা বালী ব্রীজ কেন তবে?

হর্ষবর্ধনের অটল গাম্ভীর্যকে নড়ানো যায়না, তবে তাঁর ভাইয়ের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় বটেঃ তুমিই বলো না বাপু!

ওইখেনে রামচন্দ্র সেতুবন্ধ করে এসে এইখানে বালীবধ সেরেছিলেন! তাছাড়া আর কী?

উত্তরটা হর্ষবর্ধনের সমীচীন বলেই মনে হয়, পৌরাণিক তথ্যের সঙ্গেও খাপ খায় যেন। এমন কি সেতুবন্ধের বিষয়টাও ড্রাইভারের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে, পুনর্বিবেচনার যোগ্য বলে তাঁর সন্দেহ হতে

থাকে। হতে পারে আগে ওটা আসলে রামের কীর্তিই ছিল, অবশেষে সুচতুর ইংরেজ পরে এসে সুযোগ বুঝে, কাউকে কিছু না জানিয়ে, চুপচাপ নিজের কৃতিত্ব বলে নিঃসন্দেহে চালিয়ে দিয়েছে! কিন্তু মনের সংশয় মনেই তিনি চেপে রাখেন, উচ্চবাচ্য করবার তাঁর উৎসাহ হয়না আর। বিশেষতঃ একটা অজ্ঞ—এমন কি বিশেষজ্ঞই বলা যেতে পারে অনায়াসে,—এহেন একটা লোকের সঙ্গে বাৎচিৎ করা কি তাঁর শোভা পায়?

বালীবধ না কচু। সব বাজে কথা। গোবরা মুখ ব্যাঁকায়ঃ আর বিরিজের ওপারে কী তোমার, শুনি? দণ্ডকারণ্য?

ও-পারে? আজ্ঞে, দক্ষিণেশ্বর। তারপরে অর্ধ-স্বগতস্বরে নিজেকেই যেন সে জানায়ঃ তোমাদের যমের বাড়ী আর কি!

অনুচ্চ অনুযোগটা কানে আসে গোবরারঃ য়্যাঁ, কি?

আজ্ঞে, যমলোক সটান দক্ষিণেই কিনা! শাস্ত্রেই বলে দিয়েছে। সেই কথাটাই বলছিলাম কেবল।

সে তো সবার জন্যেই দক্ষিণে—চিরকাল ধরেই ডানহাতি তোমাদের আর আমাদের কি আলাদা যমালয় নাকি? তোমার কি তাহলে উত্তরে হবে, শুনি? গোবরা ভারী চটে যায়।

ড্রাইভার আর কথা বাড়ায় না, ভীম নাগ ততক্ষণে হজম হয়ে ভয়ানক রাগ জমেছে তার। বরাহনগর দিয়ে যাবার পথে, এটা যে দশ-অবতারের অন্যতমের, অখাদ্যতমের, পীঠস্থান সে সংবাদটাও জানাবার কোনো প্রেরণা পায় না সে। টালা পেরিয়ে, খালকে ডান ধারে রেখে, বেলগেছের হাঁসপাতালকে বাঁয়ে ফেলে, সেটা যে হংসলোক, হয়তো হংসবাহন স্বয়ং ব্রহ্মারই বাসস্থান সেকথা ঘুণাক্ষরেও না জানিয়েই, মৌনব্রতী হয়ে সে এগিয়ে চলে। অবশেষে একটা বাগান বাড়ীর কাছাকাছি এসে ভস্ করে থেমে যায় গাড়ীটা।

পেট্রল ফুরিয়েছে মশাই। আর এক পাও চলবে না মোটার।

তা হলে নেমে পড়া যাক্, কি আর করা যাবে? হর্ষবর্ধন বলেন: এটা কোন জায়গা? খাণ্ডববন নয় তো? সঠিক বোলো বাপু! খাণ্ডব-দাহনে আবার মারা পড়তে পারব না আমরা!

আজ্ঞে না, বেলগেছে। বিনীত উত্তর আসে।

তাই ভালো! সামনে একটা বাড়ীও আছে দেখছি! বেশ, এই বেলগাছেই আশ্রয় নেব। নিরাপদ স্থান—কি বলিস্ গোবরা?

সেই ভালো দাদা! ঐ গাছপালাওলা বাড়ীটাই ভাড়া করে ফেলা যাক্। কলকাতা থেকে অনেক দূরেও আসা গেছে—নয় কি? তা কম্‌সেকম্ একশ মাইলই হবে প্রায়! গোবরা আন্দাজ করে।

বাগানবাড়ীর মধ্যে তাঁরা আস্তে আস্তে অগ্রসর হন। জনমানবের চিহ্নও নেই কোথাও! পোড়ো-বাড়ী নাকি? হর্ষবর্ধনের হৃদয় কম্পিত হয়, গোবরারও গা ছমছম করে। কিন্তু নাঃ, একটা জানলার ফাঁকে জনৈক বালকের মাথাই দেখা যায় যেন। যথেষ্টই ভরসা মেলে তারপর।

আরেকটু এগুতে, সেই ছেলেটি বেরিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নেয়: এই যে, এসে পড়েছেন দেখছি! অনেকক্ষণ থেকেই অপেক্ষা করছি আপনাদের জন্যে! এত দেরি হোলো কেন?

দেখেই দু'ভায়ের একেবারে চক্ষুস্থির—আর কেউ না, তাঁদেরই সদ্য-পরিচিত অন্ধকার-আলাপী শ্রীমান বাঁটকুল!

॥ চার ॥

তপ্ত খোলা থেকে গন্‌গনে আগুনে !

আকাশকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যে জ্ঞান করে ? হর্ষবর্ধন তাই করে বসলেন। বসলেন বললে ঠিক বলা হয় না, বরং সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে একেবারে তিনি ধরাশায়ী হলেন।

বাঁট্‌কুলকে অকস্মাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠতে দেখে তাঁর মাথা ঘুরে গেল। পড়ে যাবার মুখে তিনি আকাশকে ধরতে গেলেন, ধরে আত্ম-সম্বরণ করতে গেলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না। গোবর্ধনের ঘাড়ে গিয়ে পড়লেন।

দাদার এই কাণ্ডে গোবরাও বাত্যাতাড়িত কদলীকাণ্ডের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ধুলিসাৎ হয়ে গেল। বাঁট্‌কুল এগিয়ে এসে সান্ত্বনা জানাল : আহা-হা ! বড্ড লাগল নাকি ?

হর্ষবর্ধন উঠে বসেছেন ততক্ষণে, বাঁট্‌কুলের অনুসন্ধিৎসার জবাবে তাঁর মুখ থেকে একমাত্র এবং একমাত্রা যে ধ্বনি বেরিয়েছে, তাকে ঠিক হর্ষধ্বনি বলা চলে না। তিনি শুধু বলেছেন—নাঃ !

গোবরাও উঠেছে, গায়ের ধুলো ঝেড়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে এ বৃথা আড়ম্বর কেন ? মৃত্যুর মুখে পা বাড়িয়ে কি কেউ জুতো বুরুশ করে ? এই বিটকেলরা যেরকম ভয়ঙ্কর লোক, তাতে এক্ষুনি হয়ত এসে আস্ত গায়ের চামড়াই খুলে নেবে, আর চামড়াই যদি গা থেকে ছেড়ে গেল, তখন সেই চামড়ার ধুলো ঝেড়ে লাভ ?

বাঁট্‌কুল বলে, কি মশাই, পৃথিবীটা গোলাকার, কি বলেন ?

ভূগোল বিদ্যায় গোবরার ব্যুৎপত্তিই বেশী, সেই উত্তর যোগায় : হ্যাঁ, বেজায় গোল এই পৃথিবীতে !

পালিয়ে ভেবেছিলেন আমাদের হাত এড়াতে পারবেন, কিন্তু দেখলেন তো ! বাঁট্‌কুলের শব্দভেদী বাণ-প্রয়োগ ।

এ পর্যন্ত যা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে তাতেই রক্ষে নেই, তার ফলেই মাথা গুলিয়ে যাবার যোগাড়, কিন্তু তার চেয়েও বেশী তাঁকে বিচলিত করছে এর পরেও আরো না জানি কী দেখতে হয় । এতাবৎ যা দেখেছেন তাতেই তাঁকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে, কলকাতায় তাঁদের বাসায় একটু আগে যে বাঁটকুল, কলকাতা ছাড়িয়ে একশ মাইল দূরে এসেও সেই বাঁটকুল ! এই একটিমাত্র দৃশ্যেই তো তাঁরা থ হয়ে গেছেন—কিন্তু এর পরে বাঁটকুলেশ্বর বিটকেল-সম্রাট এসে তাঁদের আবার হাড়গোড় ভাঙা দ না করে ছায় ! সেই অ-দৃষ্টের, অদেখা অদৃষ্টের কিম্বা আগামী দ্রষ্টব্যের ভাবনা ভেবেই হর্ষবর্ধন বেশী কাহিল হন ।

গোবরার দূরদৃষ্টি স্বভাবতঃই একটু কম, কাজেই আসন্ন দুরদৃষ্ট তাকে তত ভাবিত করেনি, তখন পর্যন্ত কৌতূহলের ভারেই সে মুহ্যমান হয়ে ছিল । তাছাড়া দাদা থাকতে তার ভাবনা কী ? বড় বড় যা কিছু চোট দাদার ওপর দিয়েই যাবে, তার যা কিছু ভাবনা কেবল দাদাকে নিয়ে ।

তুমি ভেল্‌কি জানো না কি হে ছোক্‌রা ? গোবরা আর জিগ্যেস না করে পারে না শেষ পর্যন্ত ।

জানি বইকি । জানতে হয় বইকি । বাঁটকুল চোখ মটকে বলে : সব কিছুই জানতে হয় আমাদের ।

তুমি নিশ্চয় অন্তর্যামী ! নইলে আমরা এখানে আসব তুমি জানলে কি করে ? তাছাড়া এতদূর এসে আমার মোটারের কল

বিগড়োবে তাই বা টের পেলে কি করে? তুমি সহজ পাত্র নও। বারম্বার ঘাড় নাড়ে গোবরা।

নই-ই-তো! বাঁট্‌কুলও নিজের সম্বন্ধে সায় ছায়।

তুমি নিশ্চয় ডাইনি-বিছে জানো? হর্ষবর্ধন কথা বলেন এতক্ষণে: তা নইলে আমাদের আগে এখানে এসে পৌঁছুলে কি করে? মোটরে চেপে আসোনি তো! নিশ্চয় তুমি উড়ে এসেছ! নিশ্চয়, আমি বলতে পারি।

আকাশে ওড়ার কায়দাটা শিখিয়ে দেবে আমায়? গোবরা বায়না ধরে বসে।

সে আর এমন শক্ত কি! বাঁট্‌কুল হাত পা নেড়ে গুপ্ত বিছাটা ব্যক্ত করে: তেতালা বাড়ীর ছাদে উঠতে হয়। আরো উঁচু হলে আরো ভালো। তারপর কার্ণিশ থেকে মারো লাফ!

হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে আর কি! গোবরার একদম শিশ্বাস হয় না। তাহলে আর দেখতে শুনতে হবে না!

আমি মাটিতে লাফ মারতে বলছি কি? আকাশে লাফ মারুন। তারপর যেমন করে লোকে জলে সাঁতার কাটে, তেমনি করে বাতাসের মধ্যে সাঁতার কেটে সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যান।

সাঁতার কাটতে কাটতে? তবু যেন সন্দেহ থাকে গোবরার।

পাখীদের মতন—হুবহু। তবে বলছি কি!

আর মন্তর? মন্তর টন্তর কিচ্ছু নেই?

মন্তর একটা আছে বই কি! এক সময়ে বলে দে'বখন।

গোবরা উল্লসিত হয়ে ওঠে: চলো চলো তবে, ছাতে যাওয়া যাক্! এক্ষুনি চলো।

সবুর করতে রাজি নয় গোবরা।

হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ চক্ষে তাকান: পারবি কি উড়তে? তা তুই

হাল্‌কা পল্‌কা আছিস্‌, পারতেও পারিস। আমার দ্বারা কিন্তু পোষাবে না! জলেই সাঁতার কাটতে পারি না আমি!

চলো না দাদা, পরীক্ষা করেই দেখা যাক। তর্‌ সয়না তার: এমন আর শক্তটা কি! আকাশে ওড়া বইতো নয়!

উঁহু। আমি পারব না বাপু। হর্ষবর্ধন তত উদ্‌ব্যস্ত নন্‌!

ছিঃ! পারবনা বলতে আছে কি! নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস না থাকলে জীবনে বড়ো হবে কি করে বলো দেখি? গোবরা উপদেশ ছায় দাদাকে।

খুব পারবেন! চেষ্টা করে দেখুন না। বাঁট্‌কুলও উৎসাহদাতা।

পড়োনি পদ্যপাঠে? মনে নেই তোমার? সনাতন পদ্যপাঠ থেকে গোবরা সদ্য সদ্য পঙ্কোদ্ধার করে:

পারিব না এ কথাটি বলিয়ো না আর।
কেন পারিবেনা তাহা ভাবো একবার॥
সকলে পেরেছে যাহা তুমিও পারিবে তাহা—

তাহা'তে গিয়ে গোবরার একদম আটকে যায়, তারপর? তারপর কী?

হর্ষবর্ধন মাথা চুলকান: লেখাপড়া করে যেই গাড়ী চাপা পড়ে সেই—? তাঁরও দম আটকায়।

উঁহু, উঁহু। ওতো কথামালা, ওকি তোমার পদ্যপাঠ?

পিতা-মাতা গুরুজনে ভালোবাসো প্রাণপণে? এবার, ধারাপাত কি ব্যাকরণ কোত্থেকে বলা যায় না, হর্ষবর্ধন আরেক দফা বহুৎ টানাটানি করে বার করে আনেন।

নাঃ, তোমাকে স্মৃতিরত্ন উপাধি কিছুতেই দেয়া যায় না দাদা! তুমি আবার বলো যে আমার মেমারি নেই! তোমার মনে আছে বাঁট্‌কুল?

মনে নেই, তবে মিলিয়ে দিতে পারি—সকলে পেরেছে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা, না করিয়া উহু আহা এধার ওধার!

তোমার মাথা। তুমি তো পদ্যপাঠ আনতে গিয়ে ঠাকুরমার ঝুলি এনে ফেল্লে একেবারে! তোমাদের কর্ম নয় হে বাপু। বলে আমারই গিয়ে মনে নেই, তো, তোমরা! যাকগে, অত মনে করে আর কি হবে? উড়ে দেখলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ওড়া নিয়ে কথা।

আমার দ্বারা হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এ দেহে অসম্ভব।

তোমার সেই এক গোঁ! কেবল পারবনা আর পারবনা! কেন পারবেনা শুনি? রাগ হবার কথাই, গোবর্ধনের রাগ হয়।

হাতীকে কখনো উড়তে দেখেছিস? হর্ষবর্ধন সলজ্জভাবে বলেন। কিন্তু বলে ফেলেই, তাঁর লজ্জা হয়—নিজের সম্বন্ধে নিজের উক্ত সমালোচনা তাঁর ঠিক সমীচীন মনে হয় না, তিনি কথাটা ঘুরিয়ে নেন: আরশোলারাই ওড়ে। ফড়িংদেরও উড়তে দেখেছি। তারাই পারে, তাদের পক্ষেই সম্ভব।

বেশ, তাতে আর কী হয়েছে। আমি একাই উড়ব। আরশোলাই হই, আর তেলাপোকাই হই, আমার কিছু যায় আসে না। চলো তো হে বাঁটুকুল। মন্তরটা বলবে আমায়।

গোবরা বাড়ীর ছাদে রওনা হবার জন্য পা বাড়ায়, অনন্ত-আকাশে উধাও হবার তার অদম্য সংকল্প।

আগে চলে বাঁটকুল, তারপরে গোবরা, পরিশেষে হর্ষবর্ধন।

যেতে যেতে দাদা বলেন: যাচ্ছিস্ যখন, তখন আসামের দিকেই যাস্। বিটকেলদের বেহাতে পড়েছি, তোর বৌদিকে খবরটা দিস্ গিয়ে। আমি এখানেই থাকলাম, আমার দ্বারা আর উদ্ধার হওয়া হোলো না। কি করব? উড়তেই পারবনা যে, যা মোটা হয়ে জন্মেছি। দু কানে ডবল মন্তর নিলেও না!

হর্ষবর্ধনের দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়তে থাকে।

কি বলব বৌদিকে?

বৌদিকে? কি বলবি? কী আর বলবি! বলবার কিই বা আছে! তুই কি আর সেকথা মুখে বলতে পারবি? একটা চক পেলে লিখে দিতুম তোর পিঠে।

কি কথাটা বলই না, পারব আমি।

উঁহু। তুই উচ্চারণ করতেই পারবি না, সে কথা তোর মুখেই আনতে নেই।

বাঁটকুল পকেট থেকে এক টুকরো কপিং পেনসিল বার করে ছায়ঃ এইটা দিয়ে ওঁর কামিজের পেছনে লিখে দিন। তারপরে জলের ঝাপটা মারলেই লেখার রঙ খুলে যাবে। একেবারে রঙীন কালির মত দেখাবে।

সেই ভালো। তোর পিঠের দিকেই লিখি। তাহলে তুই দেখতেও পাবিনে। তুই যে এখনো ছেলেমানুষ! নিতান্ত নাবালক কিনা! কত সামলে রাখতে হয় তোকে আমার। নইলে তোর বখে যেতে কতক্ষণ?

হর্ষবর্ধন বোম্বাই ছাঁদে গোবরার পিঠেঃ যাও পাখী বোলো তারে—এই পর্যন্ত লিখেছেন, এমন সময়ে হর্ণ বাজিয়ে একটা মোটার ঢোকে বাগানের গেট দিয়ে। হর্ষবর্ধন সাহিত্যচর্চা স্থগিত রেখে ছাখেন, সেই ধূসর রঙের ভাড়াটে মোটারটা। ইতিপূর্বে যা তাঁদের বাহনের স্থান অধিকার করেছিল, সেই গাড়ীটাই!

বাঁটকুল বলেঃ আপনারা এই ঘরের মধ্যে বসুন। আমাদের সম্রাট এসে পড়লেন।

শোনবা-মাত্রই, হর্ষবর্ধনের হাত থেকে পেনসিল খসে পড়ল। সেইখানেই তিনি উপবিষ্ট হলেন, ধূলিমলিন মেজের উপরেই।

এবং গোবরা এসে পড়ল তাঁর কোলে—নিজের (এবং দাদার) অনিচ্ছাসত্ত্বেই। হর্ষবর্ধনের সমস্ত শক্তি যেন মুহূর্ত-মধ্যে লোপ পায়, এটুকু ক্ষমতা থাকে না যে গোবরাকে নাবিয়ে রাখেন এবং গোবরারও এমন শক্তি নেই যে নড়ে বসে।

বিটকেল-সম্রাট যখন ঘরের মধ্যে পদার্পণ করলেন, তখন হর্ষবর্ধন—যে-তিনি একটু আগে শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-লীলা দেখাতে অপারগ হয়েছিলেন সেই-তিনিই—শ্রীকৃষ্ণের আরেক লীলা প্রকট করেছেন। গোবর্ধন-ধারণ করে বসে আছেন—মহাসমারোহে।

সম্রাট ঢুকেই বাঁটকুলকে প্রশ্ন করলেন, এ কি? এঁদের এরকম করে বসিয়ে রেখেছ কেন? ঘরে কি টেবিল চেয়ার নেই?

আমি কি রেখেছি? ওঁরা নিজেরাই বসে আছেন অমনি হয়ে। বাঁটকুল জবাব দ্যায়ঃ ভায়ে-ভায়ে কোলাকুলি করছেন বোধহয়।

উঁহু। এটা ঠিক ভদ্রতা হচ্ছে না। অতিথি মানুষকে মাটিতে বসিয়ে রাখা কি ভালো? ওঁদের চেয়ারে বসিয়ে দাও।

বিটকেল-দলপতি নিতান্তই ভদ্রলোক, ভয়াবহ কিছু নন, দেখে হর্ষবর্ধনের সংজ্ঞা ফিরে আসে। বাঁটকুলের বিনা সাহায্যেই ওঁরা চেয়ারে বসতে পারেন।

সম্রাটও একটা চেয়ার টেনে নেনঃ বেশ। এইবার একেবারেই কাজের কথা হোক্। কেমন কিনা? টাকাটার ব্যবস্থা করেছেন? এনেছেন কি?

আজ্ঞে না। সবিনয়ে বলেন হর্ষবর্ধন। সঙ্গে আনতে পারিনি।

আনব কি করে? এখানে আসতে হবে জানিনি তো আমরা। গোবর্ধন জবাব দ্যায়! আন্দাজ করতেই পারিনি, বলতে কি।

টাকাটা আনাবার ব্যবস্থা করুন তাহলে। নাহলে তো ছাড়া পাবেন না সহজে। সম্রাটের বিটকেলত্ব ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে।

আনাব কাকে দিয়ে? ছাড়া না পেলে আনবই বা কি করে? আমাদের তো আর কেউ এখানে নেই। হর্ষবর্ধন অনুযোগ করেন—এক আমরা নিজেরা ছাড়া।

তাহলে দেশেই খবর দিতে হয়। বেশ, ঠিকানা দিন দেশের, আমরাই খবর দেব। বিটকেল-সম্রাটের অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশ পায়: কিন্তু মশাই, একটা কথা বলি, আপনাদের টাকা অঢেল, খবর পেয়েছি আমরা। দশ হাজারের কথাই আর নয়, গোড়াতেই বলে রাখা ভালো! পঞ্চাশ হাজারের এক পাই কমে ছাড়চিনে আপনাদের, এ হেন দামী মাল তো সস্তায় ছাড়া যায় না? হুঁ।

তাতো ঠিক। গোবরা ঘাড় নাড়ে: পরে পস্তাবে কে?

হর্ষবধন বলেন—টাকার জন্মে আমরা ভাবছি কি—

তাহলে ঠিকানাটা দিয়ে ফেলুন চট্ করে। আমরা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

আমাদের দেশ হোলো গে আসামে। ঠিকানা হচ্ছে—হর্ষবর্ধন বলতে উদ্যত হন।

উ—হুঁ—হুঁ—হুঁ—গোবর্ধন বাধা দ্যায়, মুখ বুজেই সে আপত্তি জানায়—বিনাবাক্যব্যয়ে। হুঁ—উ—উ—উ।

উঁহু—কুঁহু করছিস কেন? বাধা পেলেই বিরক্তি জাগে দাদার।

তুমি করছ কি বলো তো? দেশের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছ ওদের? বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হয় গোবরাকে। আমরা তো খোয়া গেছিই, শেষটায় বৌদিও খোয়া যাবে নাকি? ভয়ের কথাটা প্রকাশ করেই বলতে হয়।

হর্ষবর্ধন একটু ঘাবড়েই যান: তাইত! কথাটা বেফাঁস বলেনি গোবরা, মাথা ঘামাতে হয় তাঁকে। সম্ভাবনাটার ভালো মন্দ সব দিক সুচারুরূপে বিবেচনা করতে হয়।

অনেক ভেবে চিন্তে নিখুঁৎ করে খতিয়ে, অবশেষে তিনি মাথা চালেন: তা খোয়া গেলেই বা। নিজেদের তো বাঁচতে হবে আগে। আর স্বয়ং আমিই যদি খোয়া যেতে পেরে থাকি, তাহলে তোর বৌদিই বা কি এমন লাট যে—? আমার চেয়ে বৌদিই বড় তোর আপনার হোলো না কি?

তুমি বলছ কি দাদা? গোবরা ফোঁস করে ওঠে, অমন কথা মুখে আনাও পাপ। বৌদি হারালে কি পাওয়া যাবে আর!

বাস্, তুই অবাক করলি গোবরা? বৌদির ভাবনা কি তোর? কতো চাই? আমি বিয়ে করলেই তো বৌদি। পথে ঘাটেই পড়ে আছে, দেশে বিদেশেই ছড়ানো—বৌদি কত চাস?

অসংখ্য বৌদির প্রলোভনে গোবরার মন টলে না—একটি মাত্রের ওপরই ওর টান: কিন্তু ওই রকমটি কি হবে দাদা?

হর্ষবর্ধন আবার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হন। অনেকক্ষণ ধরে বহুৎ সাঁতার কেটে, বিস্তর নাকানি চুবানি খেয়ে, তাঁর গবেষণা-লব্ধ সার সত্যটি উদ্ধার করেন: আমি ভেবে দেখলাম গোবরা, সব বৌদিই এক। ঠিক চীনেম্যানদের মতোই। চীনেম্যানে চীনেম্যানে কি পার্থক্য আছে কিছু?—থাকলেও টের পাওয়া যায় না, চোখেও ধরা পড়ে না। দেখতেও সব হুবহু এক রকম, চাল-চলনেও তাই—তেমনি সব বৌদিই সমান।

হর্ষবর্ধন ঠিকানা বলতে প্রস্তুত হন।

গোবর্ধন বলে: কিন্তু আমাদের বৌদি কি রকম পাঁপর ভাজে? দাদাকে স্বপক্ষে আনতে চেষ্টা করে সে, সহজে হাল ছাড়ে না। উদরের ভেতর দিয়ে আবেদন চালিয়ে দাদার হৃদয়কে বিগলিত করবার তার প্রয়াস, এ রকম বৌদিকে তুমি পর ভাবতে পারো?

হর্ষবর্ধন একটু হ্যালেন।

আর কিরকম বেগুনী বানায়? গোবরার দ্বিতীয় দফা ওকালতি : বিলিয়ে দেবে এমন বৌদি?

হর্ষবর্ধন টলায়মান! বেগুনীর গুণ বৌদিতে সংক্রামিত হয়ে তাঁর মনকে গলিয়ে ছায়।
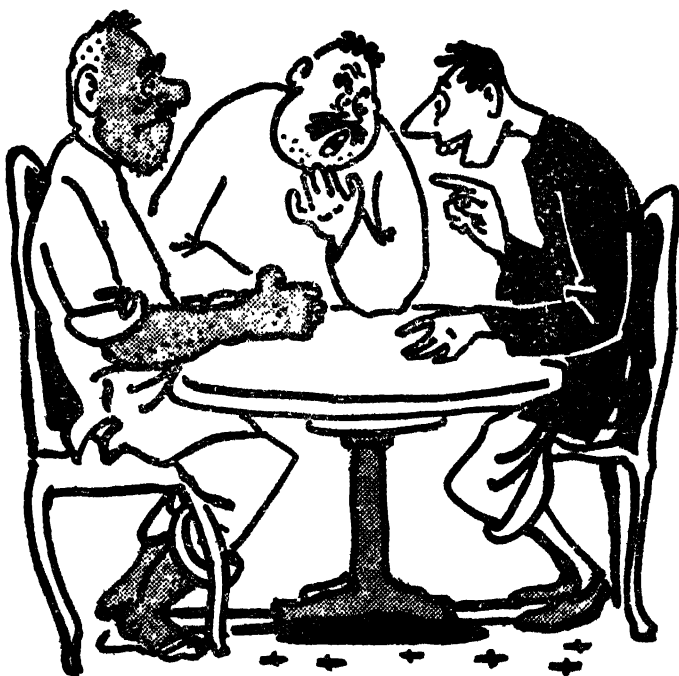
আর কী চমৎকার কুলের আচার তৈরি করে, বলো দেখি? গোবরার এবার ব্রহ্মাস্ত্র-নিক্ষেপ!

অবিলম্বে হর্ষবর্ধনের জিভে জল এসে পড়ে।

বিটকেল-সম্রাট তাড়া ছান : কই মশাই, কী হোলো?

হর্ষবর্ধনের ভোট গোবরার বৌদির তরফে চলে গেছে ততক্ষণে, তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, যাই হোক, যত বাড়াবাড়িই হোক, বাড়ীর ঠিকানা তিনি দেবেন না কিছুতেই। প্রাণ গেলেও না। বেগুনিশীল বৌদি--থুড়ি—বৌকে, দাতব্য জিনিসের ভেতরে ভাবতেই পারা যায় না।

দেরী হচ্ছে কেন? সম্রাট তাড়া দ্যান, মনে পড়ছে না ঠিকানাটা?

হর্ষবর্ধন বলেন: না মশাই, না সম্রাট-মশাই, না। অমন কুলাচার-বিগর্হিত কাজ আমি করতে পারবো না, মাপ করবেন। বলেই মুখের ঝোলটা টেনে নেন!

তবে মরে পচুন এই ঘরে—মরে ভূত হয়ে যান। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে এই কথা বলে বেরিয়ে যান বিটকেল-সম্রাট, বাঁট্‌কুলকে নিয়ে।

বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে কী একটা সুইচ টিপে দ্যান। সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে কেমন করে সেই ঘরের দরজা জানলা সব আপনা হতেই ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে যায়।

মুহূর্তের মধ্যেই সূচীভেদ্য অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে কেবল হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন। পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে—এবং তাঁরা তর্‌তর্‌ বেগে নেবে যাচ্ছেন অন্ধকার-গর্ভে!

হর্ষবর্ধন এবং তস্য ভ্রাতা, যখন সোজা রসাতলের যাত্রী, অন্ধকারের অতল গর্ভেই নিঃশব্দে পা বাড়িয়েছেন, কিম্বা পা বাড়িয়ে বসে আছেন, —বসে আছেন? বসে আছেন, ঠিক বলা চলে কি? অতল গর্ভে পা বাড়িয়ে বসে থাকাটা একটু অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হয় যেন! কিন্তু, সে যাই হোক, সেই মারাত্মক মুহূর্তে, পাশের ঘরে সম্রাট এবং তাঁর সদস্যের মধ্যে ঘোর গুরুতর পরামর্শ ঘনীভূত—

কি রকম বুঝচিস বাঁট্‌কুল?

সম্রাটের এই প্রশ্নে প্রধান মন্ত্রী মুখখানাকে খুব গম্ভীর করে

এনেছেন—পদোচিত মর্যাদা বজায় না রাখলে মুরুব্বিদের চলে কি?—তারপর ঘাড় নেড়ে বলেছেন : গতিক বড় সুবিধের না, মশাই!

তাই মনে হচ্ছে। বড় ভাইটা তো আস্ত একটা আকাট—

আর ছোটোটা হচ্ছে কাঠ-গোঁয়ার!

যখন একবার না বলেছে তখন ওদের কাছ থেকে দেশের ঠিকানা বের করা যাবে কিনা কে জানে!—সম্রাট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলচেন : আর বাড়ীর লোকরা খবর না পেলে একগাদা টাকা নিয়ে হাঁদাদের কে উদ্ধার করতে আসবে?

তাইতো! তা ছাড়া—বাঁটকুল মুখখানাকে বিরাট একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন বানিয়ে আনে : তা ছাড়া আরো ভাবনার কথা!

কি, কি? সম্রাট উৎকণ্ঠিত হন : আবার ভাবনার কথা কিহে? গোদের ওপর বিষফোড়া নাকি?

অনেকদিন ধরে না বলে বলে শেষে হয়ত নিজেরাই ভুলে যাবে বাড়ীর ঠিকানা! ওরা যেরকম এক নম্বরের বোকা তাতে আশ্চর্য নয়!

কিচ্ছু আশ্চর্য না! বিটকেলের দ্বিতীয় দফা কাতরোক্তি।

তাইতো, কি করা যায়! সম্রাট অবশেষে একটা সমাধানে এসে পৌঁছান—পুলিসেই যাবো নাকি?

পুলিসে! পথ-চলতি লাফাতে লাফাতে বাঁটকুল যেন কলার খোসায় আছড়ে পড়ে হঠাৎ। পু—লি—স্! পুলিস কেন?

একটা লোক জলজ্যান্ত পাড়া থেকে খোয়া গেল, পুলিসে গিয়ে খবর দেয়া দরকার নয় কি? পাড়ার লোক হিসেবেই তো আমার যাওয়া উচিত! পাড়ার লোকের প্রতি একটা কর্তব্য নেই?

বাস্‌রে! রসা রোড কি আমাদের পাড়া নাকি? আমরা তো বেলগেছের!

হোলোই বা বেলগেছে, সমস্ত পৃথিবীই আমদের পাড়া। যার টাকা আছে এবং টাকাটা মারবার সুযোগ আছে, সেই আমাদের আপনার লোক! আমরা দেশভক্তদেরও এক কাঠি ওপরে। বিশ্বপ্রেমিক আমরা—আমাদের বসুধৈব কুটুম্বকম্!

তাবলে পুলিস কিছু আমাদের আত্মীয় নয়। বাঁট্‌কুল বলে।

নয় কি রকম? মাস্তুতো ভাই না হোক্, পিস্তুতো ভাই তো বটে। ও একই কথা। ওদের না হলে হয়ত আমাদের চলে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের না হলে ওদের চলে কখনো? আজই যদি আমরা ধর্মঘট করি, কালই ওদের চাকরি খতম্! পুলিসের আর দরকারই থাকবে না বলতে গেলে।

কিন্তু—কিন্তু—আমরাই গিয়ে—আমাদের বিরুদ্ধে খবর দেব তো? সেটা কি ঠিক হবে? বাঁট্‌কুল ভয়ানকভাবে বিবেচনা করে: তাহলে আমরা তো আমাদের ধরিয়েও দিতে পারি। তফাৎ আর কতদূর?

হ্যাঁ, অতখানি স্বার্থত্যাগ করতেই যাচ্ছি কিনা আমি! ধরিয়ে দিতেই যাচ্ছি আর কি! ধরা পড়বার জন্যে ভারি মাথাব্যথা পড়েছে আমার! হর্ষবর্ধনদের বিটকেলরা ধরে নিয়ে গেছে, আমি শুধু এই খবরটা গিয়ে দেব কেবল! পুলিশ থেকে যখন খবর-কাগজওলারা পাবে, তখন দেশশুদ্ধ জানাজানি হয়ে যাবে। খবরের কাগজে বেরিয়ে গেলেই তো ঢি ঢি! আর—

আর—?

বাঁট্‌কুল বিস্ময়ে হাঁ করে বিটকেলের বুদ্ধিবৃত্তির বহর ছাখে।

আর—আসামে ওদের বাড়ীতে কি আর খবরের কাগজ যায় না? নিশ্চয় যায়, ওরা বড়লোক যখন। তাহলে ওদের দেশের লোক, বাড়ীর লোক, সবাই কর্তা-চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা

টের পাবে। এবং ওরা কি আর হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে না? অমন মূল্যবান জিনিস ছেড়ে দেবে, অমনি?
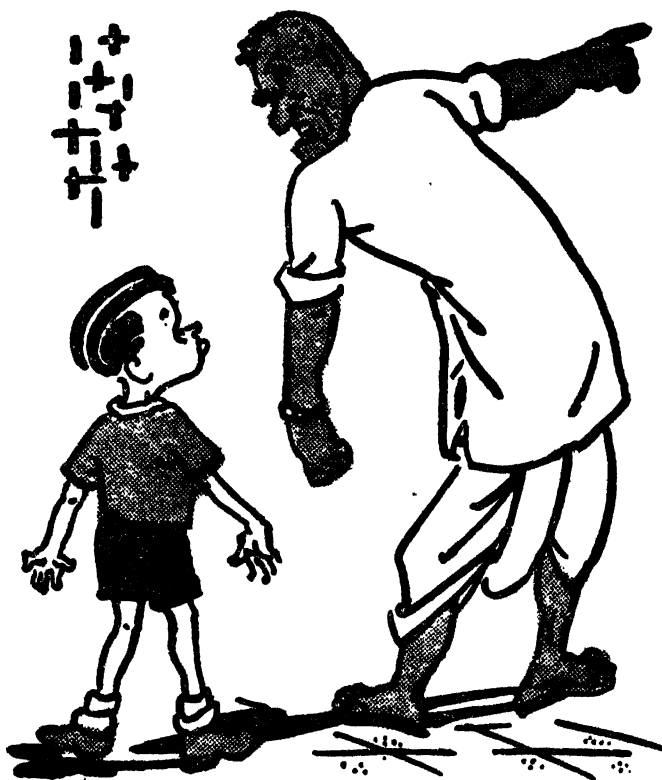
আমি সোজা থানাতেই চললাম-

তা বটে! কিন্তু—যদি উল্‌টো রকম ঘটে যায়। পুলিস উল্‌টো বুঝে তোমাকেই সন্দেহ করে পাকড়ে রাখে? তবে?

তাহলে—তাহলে একটা ভাবনার কথা বটে! কিন্তু পুলিস কি অতখানি ভুল করবে? সম্রাট ভারি সমস্যাসঙ্কুল হয়ে পড়েন।

তারচেয়ে আমি বলি কি, কাজ নেই পুলিসে গিয়ে। টাকা আদায় না হোলো, নাই হোলো, ওদের দলভুক্ত করে নেয়া যাক বরং, কি বলো তুমি? টাকার বদলে ওদের আমাদের দলে টেনে নিলেই তো হয়? রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন ছিল, তোমার সাকরেদ মোটে সাতজন আছি আমরা, ওরা হলে এখন নবরত্ন হয়ে যায়!

নবরত্ন না কচু! বিটকেল মুখ ব্যাঁকায়, ওই পুরণো বস্তাপচা রত্নদের আর নবরত্ন বলে চালাসনে বাঁট্‌কুল!

আহা, সে নব কেন? ন-জনে যে নব হয়, সেই নব! বাঁট্‌কুল বিটকেলকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

নবরত্ন না ছাই! বিটকেলের বদন এবার অষ্টাবক্র হয়ে ওঠে, এইসব গবরত্নদের নিয়ে দল গড়লেই আমার হয়েছে! তাহলে আর দেখতে হবে না!

অমন একটা সমীচীন প্রস্তাব এভাবে মাঠে মারা যাওয়ায় বাঁট্‌কুলেরও রাগ হয়ে যায়—তাহলে ঐ বিটকেলাদিত্য হয়েই থাকলে, বিক্রমাদিত্য হওয়া হোলোনা তোমার, আর তেমন নামজাদাও হতে পারলে না তো!

আসল রত্ন আনতে পারিস, নিয়ায়! আদর করে বেছে নেব। গলায় ঝুলিয়ে রাখব—হ্যাঁ। কিন্তু ওসব ভ্যাজালে আমি নেই বাপু! বলতে বলতে বিটকেল-সম্রাট বীরপদক্ষেপে বেরিয়ে যান—আমি সোজা থানাতেই চল্লাম। হ্যাঁ।

এবং বাঁট্‌কুলের—হাঁচি পড়ে যায়—বিটকেলের বেরুবার মুখেই, সেই মুহূর্তেই। কিছুতেই চেপে রাখা যায় না।

॥ পাঁচ ॥

হর্ষবর্ধনরা উড়লেন

হর্ষবর্ধনরা যখন তরতর্ বেগে নেমে চলেছেন অন্ধকার-গর্ভে, দাঁড়াবার তর্ সইছে না, সেই সময়ে কোত্থেকে যেন খিল্ খিল্ হাসি ভেসে এল !

চমক লাগে হর্ষবর্ধনের। নাঃ, তিনি হাসেননি, হাসবার মত তাঁর মনের অবস্থা নয়। এবং মুখের অবস্থা ? যদিও এখন আয়নার দিকে তাকাবার অবকাশ নেই, এবং সুযোগই বা কই, তবু তিনি অনায়াসেই, নিজের মুখের দিকে না তাকিয়েই, বলে দিতে পারেন যে. সেখানেও প্রায় তথৈবচ। কষ্টে-সৃষ্টে কাষ্ঠ-হাসি হাসতে পারাও তাঁর পক্ষে কঠিন।

ভূত নয় তো ?

হর্ষবর্ধনের বুক কাঁপতে থাকে। হাত বাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যেই জাপটে ধরেন গোবরাকে।

খিল্-খিল্-ধ্বনির পরেই, খিল খোলার ধ্বনি। দরজা খুলে, অগুন্তি আলোর সঙ্গে, বাঁটকুল ঘরে ঢোকে।

বাঃ! এই যে, ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি হচ্ছে আবার! বেশ বেশ !

গোবর্ধন লজ্জিত হয়ে নিজেকে দাদার বাহুপাশ থেকে বিমুক্ত করে। কেন, কি হয়েছে ?—তপ্তকণ্ঠেই সে বলে, নিজের ভাই থাকতে, কোলাকুলি করবার জন্যে পরের ভাই ডাকতে হবে নাকি ?

হর্ষবর্ধন চারিধারে তাকিয়ে ছাখেন। তাইতো! তাঁর কণ্ঠ থেকে বিস্ময়ধ্বনি বেরোয়।

সেইখানেই আছি তো! সেই ঘরেই—! দূর্ দূর্!

আফশোষ হতে থাকে তাঁর—ভাবলাম নাকি পাতালেই যাচ্ছি! বলিরাজার মুল্লুকে! দূর্ দূর্! সব ভূয়ো! অন্ধকারে মাথাটা ঘুরে গেছ্‌ল কেবল।

বাঁট্‌কুল তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারায় বাধা ছায়: কি মশাই? কি ঠিক করলেন? ঠিকানাটা মনে পড়ল? না কি?

য়্যাঁ? ঠিকানা? কিসের ঠিকানা? কার ঠিকানা?—হর্ষবর্ধন তখন পর্যন্ত ঠিক পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারেননি। কোথাকার ঠিকানা? পাতালের? বলিরাজার ঠিকানা চাইছো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। দিয়েই ফেলুন না দয়া করে। একবার দিয়ে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ভুলে বলে ফেলতেও তো পারেন। ভুলে বললে দোষ কি আর?

বলিরাজার ঠিকানা? বটে! হর্ষবর্ধন দাড়িতে হাত ছান, ভাবিত হয়ে পড়েন ভারী, চোখ মুখ কপাল সব কিছু সিঁটকে ওঠে ওঁর। অবশেষে গোবরার দিকে চিন্তাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন: জানা আছে নাকি তোর? বলির ঠিকানাটা—?

বলাবলি আর কি? গোবরা বলে বাঁট্‌কুলকে: তুমি যদি আমাকে ওড়বার মন্ত্রটা শিখিয়ে দাও, এক্ষুণি তাহলে আমি তোমাকে বৌদির ঠিকানাটা বলে দেব!

সে আর বেশি কথা কি! বাঁট্‌কুলের উৎসাহ উছলে ওঠে, এই কথা? এ আর কটা কথা! এই তো মন্ত্র।—টা টি টুক্‌মুক্ টেন্‌অ বাটায়! শিখে নিন! মুখস্ত করে ফেলুন চটপট।

টা টি টুক্‌মুক্ টেন্‌অ বাটায়? কেবল এই? আর কিছু না?

গোবর্ধনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় সন্দেহবাদ ! মন্ত্র তো অনুস্বর বিসর্গ কই ? অং বং কোথায় ? নিশ্চয় আছে আরো।

এইটুকুই তো জানি, আর তো জানিনে। বাঁটকুল নিজের নিঃস্বতা জানায়।

আবার কি ? মন্ত্র আবার কত বড়ো হবে ? বাঁটকুলের হয়ে হর্ষবর্ধনই ওকালতি করেন : দেড় গজ হবে নাকি ? মন্ত্র তো ফলার করার জিনিস নয় ! ফলা নিয়ে কথা ! ফলাও করার কথা !

হ্যাঁ, কথায় বলে—ফলেন পরিচীয়তে ! ফলিয়ে দেখুন না, তাহলেই টের পাবেন তখন। বাঁটকুলও সায় ছায় সেই সঙ্গে, টা টি টুক্‌মুক্‌ টেন্‌স বাটায় ! আওড়ান আর উড়ুন ! ব্যাস্‌ !

উড়ব বইকি ! উড়ব না তো কি ছাড়ব ! পড়ে থাকতে যাব না কি তোমাদের এই মগের মুল্লুকে ? তবে কি না, পাখা গজালেই হোলো ! আর কিচ্ছু চাই না !

বেশ, এইবার তবে বৌদির ঠিকানাটা দিয়ে ফেলুন দিকি।

তোমার বৌদি নয়, বৌদি আমার। গোবর্ধন বুক ফুলিয়ে বলে : তোমারও বৌদি না এবং এই ভদ্রলোকেরও না। বৌদি হচ্ছে আমার—কেবল একা আমার। মুখ সামলে কথা বোলো, বুঝলে হে ছোকরা ? বৌদির গর্বে গোবরার বুক আরো ফুলে ওঠে : দাদার বিয়ে দিয়ে তবে বৌদি পেতে হয়। দাদা আছে তোমার, যে, বৌদি পাবে ? অত সহজ নয় বৌদি পাওয়া। একটা বৌ কিম্বা দিদি পাওয়ার চেয়েও শক্ত। তারপর বলে—হ্যাঁ, ঠিকানা চাচ্ছিলে তুমি ? বৌদির ঠিকানা হচ্ছে আসাম।

আসাম তা তো জানি, কিন্তু আসাম কোথায় ? বাঁটকুলের ব্যাকুল প্রশ্ন।

আসাম কোথায় ? দাঁড়াও বলছি—গোবর্ধন অগত্যা বাধ্য

হয়ে ভূগোল স্মরণ করেঃ আসাম হচ্ছে বাংলাদেশের মাথায়। একেবারে মাথায় চূড়ামণি আর কি! আর—আর হিমালয়ের পাদদেশে। প্রায় পাদদেশেই, বলতে গেলে।

এমন লম্বা ঠিকানায় কি বুঝব? খোলসা করে বলুন।

আরো খোলসা করে? হিমালয় কোথায় জানতে চাও নাকি? হিমালয় খুঁজে পেলে আসামও খুঁজে পাবে। খুব সহজেই পাবে। নেপাল ভুটান আসাম প্রভৃতি সব কাছাকাছি। আর হিমালয়? হিমালয় হচ্ছে ভারতবর্ষের উত্তরে—বিলকুল উত্তরে—

সব্বাই জানে! তা কে জানতে চেয়েছে? বাঁটকুল ঠোঁট উলটোয়।

তবে কি ভারতবর্ষ? ভারতবর্ষ কোথায় জানতে চাও নাকি? ভারতবর্ষ হচ্ছে হিমালয়ের দক্ষিণে আমরা যার ওপর দাঁড়িয়ে আছি। গোবর্ধন ব্যক্ত করে। সহজেই করে ছায়।

দেখুন দিকি মশাই! বাটকুল এবার হর্ষবর্ধনকে মধ্যস্থ মানে, আমার কাছে মন্ত্রটা জেনে নিয়ে ঠিকানাটা দিচ্ছেন না এখন। এটা কি ওঁর ভালো হচ্ছে? কাতর স্বরেই সে বলে।

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের রাজনীতি, রাজোচিত চালটা বুঝতে পেরেছেন এতক্ষণে, বুঝে বাহবাই দিয়েছেন মনে মনে। তিনি গোবর্ধনেরই অনুসরণ করেনঃ কেন, ঠিকই তো বলেছে ও! আসামের ঠিকানাই হোলো আসল! আগে আসামে তো গিয়ে পৌঁছোও—তারপর আমাদের বাড়ী খুঁজে বের করতে দেরি কি আর? তখন তোমার ঐ মন্তর ছাড়ো আর এনতার ওড়ো! চারধারে উড়তে থাকো—উড়তে উড়তে ঘুরতে থাকো—ঘুরতে ঘুরতেই চোখে পড়বে। কত কাক-চিলই তো উড়ে গিয়ে বসছে আমাদের বাড়ীতে, হরদমই বসছে, রোজই বসছে! কই, তাদের তো ভুল হচ্ছে না কখনো!

কিন্তু একটা জায়গার নাম তো জানা চাই। উড়তে সুরু করব কোত্থেকে?

ও! এই কথা! গৌহাটি! গৌহাটিই হোলো গিয়ে আমাদের শহর। যেমন তোমাদের এই কলকাতা। ওড়বার পক্ষে শহরই প্রশস্ত নয় কি?

গৌহাটি? তাই বলুন! তা এতক্ষণ বলতে হয়! গৌহাটির নাম শুনেছি বইকি! দাঁড়ান্ একটু, সম্রাটকে একটা টেলিফোন করে আসি! চলে আসছি এক্ষুনি!

বাঁট্‌কুল লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যায়। কোনোদিকে দৃক্‌পাৎ না করেই দৌড় মারে।

এই তালে পালাই চলো। গোবরা দাদাকে পরামর্শ ছায়।

ছাত দিয়ে? তোর ঐ মন্তর ফুঁকে? হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন: বলেছি তো, ওসব ওড়া-টোড়া আমার পোষায় না বড়ো।

আহা, ছাত দিয়ে কেন? উড়তে কে বলছে? সদর দরজা খোলাই তো রেখে গেছে ছোঁড়াটা। তাড়াতাড়িতে শেকল আঁটতে ভুলে গেছে। এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ! ও আসবার আগেই—

গোবর্ধন দাদাকে নিয়ে চলে। প্রায় টানা-হ্যাঁচড়া করেই।

হর্ষবর্ধন ভয়ে-ভাবনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নড়াচড়ার উদ্দীপনা খুব বেশি ছিলনা। এখন একটু গড়াতে পারলেই যেন ভাল হয়, ওঁর মনে হচ্ছিল কেবল। হোলোই বা শত্রুর বিবর, কিম্বা মৃত্যুর কবর—ঘুমুতে কি হয়েছে? বাধাটা কোনখানে? কিন্তু ভাইয়ের উৎসাহের ধাক্কায়, বৃহৎ বপু নিয়ে, বাধ্য হয়ে ওঁকে দাঁড়াতে হয়, এবং হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে নিজেকে বাড়াতে হয় বাইরে।

এত বড়ো বাগান-বাড়ীটা একদম খাঁ খাঁ! কেউ নেই কোত্থাও। এদিক ওদিক ঘুরে-ফিরে চুল চিরে ছাখেন ওঁরা। গোবর্ধন পা

বাড়িয়েই পালাতে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু হর্ষবর্ধন বিচক্ষণ, তিনি বলেছেন —না। কেউ কোথাও ঘাপ্‌টি মেরে লুকিয়ে আছে কিনা দেখা দরকার আগে! না দেখে শুনে বোকার মত দৌড়োই, আর পেছন থেকে তাড়া করে তাড়িয়ে এসে ধরে ফেলুক আর কি, আর তারপর মার লাগাক দমাদ্দম্‌, তাহলেই তো সুখের চোদ্দপোয়া!—

হ্যাঁ, মার লাগালেই হোলো! নাগালে পেলে তো! পালিয়ে যাব না এক ছুট্টে?

না বাপু। ও-সব দৌড়ঝাঁপ আমার কর্ম না! আমি বাপু পারব না তুড়িলাফ খেতে, আমি তোমাদের ঐ চ্যাঙড়াদের মতো নই। আমরা হলাম সাবেক মানুষ। দৌড়ঝাঁপের ধার দিয়েই আমি না। লাফ খাবার নামটিও কোরো না আমার কাছে! ওসব ফচকেমিতে আমি নেই। দৌড়োনো? বাবাঃ। সে হচ্ছে চড়ার চেয়েও খারাপ—ঢের ঢের খারাপ! তারচেয়ে আকাশে ওড়াও ভালো। হ্যাঁ।

কিন্তু না, যতদূর খুঁটিয়ে সম্ভব, চারিধারে পরিদর্শন করে কয়েকটা কাঠবেড়ালী এবং কতিপয় উচ্চিংড়ে ছাড়া আর কোনো জনপ্রাণীর তাঁরা পাত্তা পান না! দু একটা টিকটিকি অবশ্য তাঁদের চোখে পড়ে, কিন্তু তাদের গোয়েন্দা জাতীয় বলে সন্দেহ করা চলে না। ইতরতার যথেষ্ট অভাব সত্ত্বেও তারা ইতর প্রাণীর মধ্যেই বিবেচ্য।

অতএব, দৌড় মারবার কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। হর্ষবর্ধন চলেন, লম্বা লম্বা পা ফেলেই চলেন, অকুতোভয়েই গেট পার হন, গট্‌ গট্‌ করেই হেঁটে চলেন তিনি। টিকটিকি কি কাঠবেড়ালীর থেকে কোনো আক্রমণের আশঙ্কা ছিল না। আর উচ্চিংড়ে? সে তো জলজ্যান্ত একটাকে নিজের ল্যাজে বেঁধে নিয়েই চলেছেন। উচ্চিংড়ে আর উচ্চ্যাংড়ায় কতখানি তফাৎ?

রাস্তাও নির্জন! মাঝে মাঝে এক একটা মোটার হুস্ হুস্ করে চলে যায়! অনতিদূর থেকে ইঞ্জিনের হাঁস্‌ফাঁস্ ভেসে আসে, আবার কোথায় সুদূরপরাহত হয়ে যায়। কাছেপিঠে কোথাও দিয়ে রেলগাড়ীর যাতায়াত আছে, আন্দাজ করা কঠিন নয়। দূরে দূরে কদাচিৎ পদাতিকের টিকি যে না দেখা যায় তা না, কিন্তু ভালো করে পা চালিয়ে, টিকির অতিরিক্ত বেশি কিছু দেখবার দুশ্চেষ্টা করতে গেলেই, সে-সব জনমনিষ্যি, আশেপাশে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে পড়ে। বাতাসেই মিলিয়ে যায় নাকি, কে জানে!

অনেক দূর পর্যন্ত তাঁরা এগোন, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

থামাবো একটা মোটারকে? হর্ষবর্ধন বলেন হঠাৎ।

কি করে থামাবে? গোবরার বিস্ময় লাগে।

কেন, ফাস্‌টো বুকের লাস্‌টো চ্যাপ্‌টার্ হয়ে!

সে আবার কি, দাদা?

তোর একেবারে কিচ্ছু মেমারি নেইরে গোবরা। কি করে যে তুই টিঁকে আছিস তাই আমার তাক্ লাগে। আশ্চয্যি। সেই যেরে—একটা ছেলে—মানে একটা ছেলের ছবি সূর্যের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে—দুহাত দুদিকে লম্বা করে দিয়েছে—উত্তরে আর দক্ষিণে—মনে পড়ছে না তোর?

হ্যাঁ হ্যাঁ—গোবরার মনে পড়ে যায়: তা, কি হয়েছে তার?

হবে আবার কি! হর্ষবর্ধন বলেন: বলছিলাম এই যে, যদি সেই ছবির মত হয়ে, রাস্তা জুড়ে দাঁড়াই, তাহলে কি মোটারগাড়ী থামাবে না বলতে চাস্? একটা না একটা থামবেই! আমাকে ভেদ করে যেতে পারবে না কোনো কিছু!

গোবর্ধন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে: উঁহু। ওসব ঝক্কি নিয়ে কাজ নেই দাদা! মোটার গাড়ীর কি মর্জি হবে কে জানে! হয়ত—

আশঙ্কাটা সে ব্যক্ত না করে পারে না: ধাক্কাটাক্কা লেগে, ছবি ভেঙে যেতেও পারে।

হ্যাঁ, ভাঙলেই হোলো! দেখেছিস একবার—কি রকম ছবি একখানা! ইয়া ছাতি! ইয়া ভুঁড়ি! যাকে শাস্ত্রে বলেছে শাল প্রাংশু মহাভুজঃ! এ-ছবি আর ভাঙ্তে হয় না! নিজের দিকে তিনি গোবরার, এবং স্বয়ং নিজের সপ্রংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে হ্যাঁ, ফ্রেমট্রেমের কথা বলা যায় না। মোটারের ছোঁয়া লাগলে ওসব গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে বটে। তা, তুই না হয় একটু দূরেই থাকিস।

গোবরাকে তিনি নিতান্তই একটা ফ্রেমের মধ্যে গণ্য করেন—আস্ত একখানা কাঠের ফ্রেম—ফ্রেম-আপ্—তাছাড়া আর কি?

গোবরা কিন্তু তর্কাতর্কির মধ্যে যায় না। হর্ষবর্ধন ক্ষেপতে কতক্ষণ? দাদাকে তার জানা আছে। এবং এই বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে, দাদার যে অসময়ে ছবি হবার দুর্দমনীয় অভিরুচি, সেই সঙ্কটক্ষণে, দাদাকে এবং নিজেকে—ছবি ও ফ্রেম একাধারে সামলে রাখাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। ঠিক যে ফ্রেমের মায়াতেই সে পিছিয়ে যায়, তা নয়, ছবির প্রতিও একটা অনির্বচনীয় টান অকস্মাৎ সে অনুভব করে। ছবি ছাড়া কি ফ্রেম থাকতে পারে?

তারচেয়ে বরং ঐ সাইকেলওলাকেই আটকাও—সে অন্য বুদ্ধি বাৎলায়: তাহলেই হবে।

যদি যায়, অল্পের ওপর দিয়েই যাক, এই তার মৎলব।

পথের মধ্যে হঠাৎ, যারপরনাই বাহুবিস্তার দেখে সাইকেলওয়ালা তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে: কি? ব্যাপার কি? বাঘ বেরিয়েছে?

বাঘ! জানিনে তো! হর্ষবর্ধনের পিলে চমকে যায় শুনে, আজ্ঞে—একটা কথা জিগ্যেস করছিলুম! বলছিলুম কি, যে দিল্লী আর কদ্দুর?

দিল্লী! দিল্লী কেন? বেলগেছেয় বসে হঠাৎ দিল্লীর খোঁজ কেন? লাড্ডু টাড্ডু দরকার পড়েছে নাকি?

আজ্ঞে না—এবার গোবরা যোগ ছায়: এখান থেকে দিল্লী কদ্দূর, সেটা জানতে চাইছিলাম। সেইদিকেই চলেছি কিনা আমরা।

রাঁচি থেকে রওনা হয়েছেন বুঝি? তা দিল্লী এখনো দূর আছে—সাইকেলওয়ালা প্যাড্‌লিং সুরু করতে করতে বলে: এখান থেকে দিল্লী—তা বেশ খানিকটা দূরই বই কি!

সাইকেলওয়ালা চলে গেলে হর্ষবর্ধন রেগে ওঠেন, হঠাৎ খামখা কি মুস্কিল বাধালি দ্যাখ্ দিকি! চুরি গেছলাম ভালো গেছলাম, পদে ছিলাম তবু—পালাতে গিয়ে কি বিপদে পড়া গেল দ্যাখ্‌তো! কি সব ঝঞ্ঝাট ডেকে আনলি দ্যাখ্ দিকি! এখন কোথায় দিল্লী তার ঠিক নেই, রাস্তাঘাটও অজানা, এধারকার লোকগুলোও সুবিধে নয়—লোকের পাত্তাই নেই তো লোক! তার ওপরে আবার বাঘ বেরিয়েছেন দয়া করে! এইবার আর কি, সবংশে বাঘের পেটে গিয়ে হজম হয়ে বসে থাকা যাক। ব্যস্!

॥ ছয় ॥

গোবর্ধন উড়লো! সত্যিই!

এই বিদেশ-বিভুঁয়ে, বেঘোরে মারা যাবার তথ্যটা যতই গভীর করে হর্ষবর্ধনের অন্তর্গত হতে থাকে, ততই তিনি আরো খাপ্পা হয়ে ওঠেন। রেগেমেগে, গোবরাকে উজবুক উপাধি দিয়ে ফেলতেও তাঁর দ্বিধা হয় না।

দ্যাখ্ তো! কী ফ্যাসাদ বাধালি দ্যাখ্ দিকি। লোকে প্রাণ নিয়েই পালায়। পালাতে গিয়ে কেউ আর প্রাণ দ্যায় না। কিন্তু এ কী করলি দ্যাখ্ তো? ছ্যা—ছ্যা!

হর্ষবর্ধনের ধিক্কৃতি এবং মুখবিকৃতির আর অন্ত থাকে না। বলেন, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় আর বলেছে কেন? বিটকেলের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে এখন বাঘের মুখে মরতে হোলো। এরকম দুর্দশার চেয়ে বিটকেলের গুঁতোও যে ভালো ছিল বাপ্! পেটে খেলে পিঠে সয়, কথায় বলেছে; কিন্তু এখন বাঘের পেটে গেলে আর কোথায় সইবে? শুনি?

গোবর্ধন কি বলবে? এসব অভিযোগের কি জবাব আছে? প্রাণ তো যেতেই বসেছে, সেজন্যে আর মন খারাপ করে লাভ কি, তর্কাতর্কিতেই বা কি ফল? খোয়া যাবার মুখে, যতটা সাধ্য, দাদার বাধ্য হয়ে দাদাকে খুসি করতেই সে চায়। দাদার কথায় সায় দিয়ে সান্ত্বনাদানের চেষ্টাই সে করে: বাঘে ছুঁলে আবার আঠারো ঘা! জানো তো দাদা?

একে এহেন দুর্ভাবনার উত্তাপ, তার ওপরে আবার টিপ্পনির ফোড়ন-কাটা, হর্ষবর্ধনের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনি চড়বড় করে ওঠেন ঃ হ্যাঁ, ঘা বানাতেই আসছে কি না তারা। ছুঁয়েই ছেড়ে দেবে কি না! তোর মতই হাঁদা কিনা বাঘগুলো? আগে গিলে বসে, তারপরে তাদের অন্য কথা! বাঘ বলছে কেন তবে? বাগে পেলেই হোলো! ব্যস্! আর হুঁ-হাঁ নেই! হুম্!

হুম্ নয়, হালুম্! গোবরা আবার কথা বলে ঃ হালুম্! আর গেলুম্!

হর্ষবর্ধনের ইচ্ছা করে, বাঘের আশু প্রয়োজনীয় ভূমিকাটা, বিকল্পে, তিনিই অভিনয় করে বসেন। আঠারো না হোক কয়েক ঘা অন্ততঃ তক্ষুনি বসিয়ে ছ্যান গোবরাকে।

এক্ষুনি একটা বাঘ বেরিয়ে এসে তোকে ধরে আর গেলে কোঁৎ কোঁৎ করে—আমি দেখি! দাঁড়িয়ে দেখি আমি তোর মত পাঁচটাকে খেলে তবে আমার আনন্দ হয়!

সুখাবহ শোচনীয় দৃশ্যটাকে তিনি কল্পনায় হৃদয়ঙ্গম করে উপভোগ করেন।

তাতো হবেই!—গোবর্ধনের ক্ষুণ্ণস্বর ঃ হবে না কেন? সীতাকে বনবাসে রেখে এসেছ, এখন লক্ষ্মণ বর্জন করলেই তো সুখের তোমার চোদ্দ পোয়া! তার চোখের দৃষ্টিও অক্ষুণ্ণ থাকে না, অশ্রুবাষ্পে ভরে ওঠে।

যা—যাঃ! ভারী আমার লক্ষ্মণ এসেছেন! তুই গেলে আমার একটা দুর্লক্ষণ যায়! এরকম পদে পদে মরতে হয় না আমাদের। আর তোর বৌদিও কিছু সুলক্ষণ নয়! যা বল্‌ব, হক্ কথা। সীতা বলতে হয় তুই বলগে যা, যত তোর প্রাণ চায়,—আমি ওকে সূর্পনখাও বলতে পারব না! মন্দোদরীও না, হিড়িম্বাও না।

বাড়ী ফিরে আমি ঠিক বলে দেব বৌদিকে।

হর্ষবর্ধন ভয় খান না, বলেন, জানা আছে আমার। তোর মনে থাকলে তো তদ্দিন। মেমারিই নেই তোর, যে মহামারী বাধাবি।

আমি মুখস্থ করে ফেলছি এক্ষুনি! গোবর্ধনের ঘন ঘন ঠোঁট নড়তে থাকে। কী কী উপমা বৌদিকে দিতে দাদা একেবারেই নারাজ, সেই অনুপম বিশেষণদের সমস্ত তালিকাটা সম্পূর্ণ নিজের উদরস্থ করবার দুরূহ অধ্যবসায়ে সে উঠে পড়ে লেগে যায়।

স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, শাস্ত্রেই বলে দিয়েছে! হর্ষবর্ধন গজ গজ করেন, শাস্তর কি আর মিথ্যে বলে? না তোর বুদ্ধি শুনি, না আজ এমন বেঘোরে মরি!

আমি বুঝি স্ত্রী? গোবরা এবার প্রতিবাদ না করে পারে না, মেয়েছেলে বুঝি আমি?

মেয়েছেলে হলেও রক্ষে ছিল! তুই মেয়েরও অধম। বলেই তো দিয়েছি, তুই একটা নাৎনি! মানুষের মধ্যেই ধর্তব্য না।

হর্ষবর্ধন আর কালবিলম্ব না করে দিল্লীর উল্টো দিকে লম্বা পা ফেলতে সুরু করে দ্যান। বাঘের আহার্য হবার আগে পায়ের সাহায্য নেওয়া—যতক্ষণ পর্যন্ত ওগুলো আস্ত আছে এবং পেটের মধ্যে সেঁধয়নি, মানে, বাঘের পেটের মধ্যে—তাকে চালানোই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে তাঁর ধারণা হয়। তিনি পা চালিয়ে চলেন, তীর বেগেই চলেন, ষ্টিম রোলার যেমন তীরবেগে চলে, প্রায় তেমনি ক্ষিপ্র-গতিতে—মাঝে মাঝে ডানদিকের ঘাড় ঈষৎ কাৎ করে দেখে নেব—নাঃ, গোবরা ঠিক ছায়ার মতই অনুসরণ করছে বটে—তুর্লক্ষণের মতই হুবহু!—এবং তার বাঁ দিকের আধখানা মুখ থেকে মৃদুমন্দ হাসি স্বতঃই বিস্ফারিত হয়ে বহির্গত হতে থাকে।

এদিকে বিটকেল-সম্রাটের রাজধানীতে দারুণ হৈ চৈ! বাঁট্‌কুল

টেলিফোন করে ফিরে এসেই ছাখে সদর গেটে এক জটিল জটলা। হর্ষবর্ধনরা উধাও হয়েছেন, জানতে তার বেশি দেরি হয়না।

আমি তো গেছলাম ফোন করতে, তোমরা সব গেছলে কোথায়? বাঁটকুল কৈফিয়ৎ চায়ঃ কোন চুলোয়?

আমি তো এইমাত্র ফিরছি—! সোফার বলেঃ সম্রাটকে পৌঁছে দিয়ে আসছি এই। এসেই দেখি এই কাণ্ড।

ঝক্কম্‌ঝক্কা, তুমি? তুমি কোথায় গেছলে দারোয়ানজী? বাঁটকুলের তিক্ত স্বর।

দারোয়ানজীর ভগ্ন কণ্ঠের সঙ্গে ভাঙা বাংলা সংমিশ্রিত হয়ে যা বেরোয় তার মর্মঃ তার পাশের বাড়ীর বন্ধু লটপট সিংএর নিকট ডলিত খৈনির প্রত্যাশাতে সে একটুক্ষণের জন্যই গেটকে ছেড়েছিল। লটপট সিংও ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত ছিল না, ঝক্কম্‌ঝক্কার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সেও সাফাই দ্যায়।

খৈনি খেতে গেছ! তবে আর কি, মাথা কিনে নিয়েছ আমার! বাঁট্‌কুল রাগের চোটে তিড়িং মিড়িং করে লাফাতে থাকেঃ আর তুমি? মালি বাবাজীবন? তুমি কেন কেটে পড়েছিলে? কি খেতে, শুনি?

মালি, ঠিক কিছু খেতে নয়, তবে খাদ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারেই বিজড়িত হয়ে, কিছুক্ষণের জন্য কাছাকাছি অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, স্বাভাবিক সংকোচ কাটিয়ে, কথাটা তিনি কবুল করেই বসেন। আর কিছু নয়, কতকগুলো পেয়ারা কেবল! এই বাগানেই সেইগুলো সঞ্চয় করে বেলগেছের বাজারে—হ্যাঁ, তা বাঁট্‌কুলবাবু যদি তাকে বামাল সরানো বলেন, কি চোরাই মাল বেচাই বলেন—সে আর কী বলবে? মালির দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি তো কেউ আর দ্যাখেনা। কখন ছুটো তলায়-পড়ে-থাকা পেয়ারা কুড়িয়ে,

তাকে পয়সায় বাড়িয়ে, পান-দোক্তায় পরিণত করবার চেষ্টা করেছে, সেইটাই খালি লোকের চোখে পড়ে। দারোয়ান যদি দ্বার ছেড়ে খৈনির তালে যেতে পারে তাহলে তার মালি থেকে বামালী হওয়াটাই খুব দোষের হয়েছে বইকি!

বেশ, তোমরা গিয়েছিলে তো দরজাটা লাগিয়ে যেতে হয়েছিল কি? বলি, দরজা তো একটা আছে? দরজাটা আছে কি জন্যে?

বাঁটকুলের এই জিজ্ঞাসার জবাবে কেউই কিছু বলতে পারে না, —দরজাটাও না।

এমনই উৎকণ্ঠার সময়ে, হর্ষবর্ধন, বীর সেনানায়কের মত ধীর পদক্ষেপে, পশ্চাদ্বর্তী গোবর্ধন-রূপ বিরাট সৈন্যবাহিনীকে অদৃশ্য অঙ্গুলি-হেলনে অবহেলায় চালিত করে একেবারে তাদের মধ্যিখানে এসে পড়েন।

বাঃ, কোথায় গেছলেন মশাই আপনারা? আচ্ছা লোক বটে! বাঁটকুল আকাশ থেকে পড়ে, কিম্বা, আকাশেই সোজা উঠে পড়ে—সেই পরমাশ্চর্যের মুহূর্তে সঠিক সে বুঝতে পারেনা।

হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম, বেড়াচ্ছিলাম একটু। হর্ষবর্ধন গম্ভীর কণ্ঠে বলেন: কেন, হাওয়া কি খেতে নেই? হয়েছে কি?

না, না, হয়নি কিছু। কি হবে? বাঁটকুল সামলে নেয়: আপনাদের বেড়িয়ে ফেরার অপেক্ষাই করছিলাম আমরা। কখন ফিরবেন সেই কথাই হচ্ছিল আমাদের।

ফিরতে আপনাদের দেরী হচ্ছিল কি না! সোফার বলে।

দেরী? এ আর এমন কি দেরী হয়েছে?—

হর্ষবর্ধনের অভিযোগ হয়: আমার এই লক্ষ্মণ-ভায়ার পরামর্শ শুনলে দেরী কাকে বলে বুঝতে পারতে! এজন্মে ফিরতেই পারা যেত কি না সন্দেহ।

এতক্ষণ হয়ত বাঘের পিঠে চেপে—পিঠে ? উঁহু, বাঘের পেটে চেপে জঙ্গলে-জঙ্গলেই ঘুরছি ! গোবরার কথা বেরোয়।

ঝক্কম্‌ঝক্কা তক্ষুনি, আর দেরী না করে, বন্ধু লটপট সিংয়ের বাহুবলের সাহায্যে, সেই বিরাটকায় গেটের প্রকাণ্ড পাল্লা দুটো ভিড়িয়ে, তাতে পেল্লায় এক তালা লাগিয়ে দ্যায়, সেই দণ্ডেই।

রাম বোলো, লটপট সিং ! বলে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফ্যালে। রাম রাম বোলো ভাইয়া।

নেহি নেহি, ঝক্কম্‌ঝক্কা ! রাধাকিষণ বোল্‌না চাহিয়ে !

হর্ষবর্ধন বলেন : হ্যাঁ, ভালো করে দরজাটা এঁটে দাও বাপু ! যেন একটুও ফাঁক না থাকে কোথাও। বাঘ বেরিয়েছে কি না ! আস্ত বাঘ, বুঝেচ ?

বাঘ কেনো বাবুজি, ইস্‌দফে কোই বিল্লি ভি বাহার্‌তে সেক্‌বে না ! সীতারাম ! সীতারাম ! বলে সে ভয়ানক আরামের হাসি হাসে।

হাথীকোভি নিকাল্‌না মুস্কিলই হ্যায় ! হর্ষবর্ধনের দিকে লক্ষ্য করেই লটপট সিংয়ের এই হাতীমার্কা কটাক্ষ !

হাতী কো বাৎ তো হচ্চে না পাঁড়েজি !—হর্ষবর্ধন লটপট সিংকে বোঝাতে চেষ্টা করেন : বাঘকো কেয়া বোলতা হিন্দীমে ? শের ? ঐ শের বাহার হোয়েচে।

শেরের বাহার সিংহ-শাবক কতখানি বোঝে, সেই জানে, কিন্তু গোবরা দাদাকে আশ্বস্ত করে : শের শের কি বাজে বক্‌চ দাদা ? গেটের কোথাও এক চুল ফাঁক আছে নাকি ? একটা আধসের গলাই শক্ত, তা, সের !

যাক্‌গে। যেতে দে ! বাঘের পেটের চেয়ে নিজের পেটের ভাবনা ভাব্‌ আগে···বৎস বাঁট্‌কুল ! বাঁট্‌কুলচন্দ্র ! শোনো !

এদিকে এস তো। এই বলে হর্ষবর্ধন বুকপকেটের কোণ থেকে ঘামে-ভেজা একখানা কাগজ টেনে বার করেন: এই নোটখানা নাও! আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা কর তো বাপু! খিদেয় নাড়ী চিঁ চিঁ করছে। গোবরার কি! ও তো নারীর অধম। খিদের বালাই নেই ওর। বাবাঃ! সকাল থেকে কি কম হায়রাণ-পরেশান গেছে? যাও তো বাপু ছেলে, কিছু খাবার-টাবারের যোগাড় ছাখ তো আগে।

জড়ীভূত নোটখানাকে বিমুক্ত করতে করতে বাঁটকুল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে: এ যে একশো টাকার নোট! বাঃ!

কেন, ওতে কি কুলোবে না?

এত কী হবে? দু তিন টাকাই ঢের! সাতানব্বই টাকা ফেরতা আসবে।

দোহাই বাপু, আর যাই করো, ফেরতা টেরতা এনো না। ওতে আমরা ভয় পাই, ভারী দমে যাই আমরা। আমাদের জানা আছে, টাকাকড়ির কখনো ফেরতা আসে না—ওদের হচ্ছে অগস্ত্য-যাত্রা! কর্পূরের মতই কেমন করে যেন উপে যায় ওরা! তা, অপরের হাতেই কি, আর নিজের হাতেই কি! ওদের একবার এহাত থেকে ওহাত, মানে বেহাত হলেই হোলো!

এতে আপনাদের একমাসের খরচ চলেও অনেক বেঁচে যাবে। আমি বলছি!

এই সেরেছে! হর্ষবর্ধনের চোখে মুখে বিভীষিকা প্রকট হয়ে ওঠে: বলছি না, যে বাঁচাতে হবে না? বাঁচিয়োনা একদম। টাকা বাঁচালে মানুষ মারা পড়ে—তা জানো? টাকা মেরেই মানুষ বেঁচে থাকে। আধমরা হয়ে টাকা বাঁচিয়ে লাভ? তারচেয়ে যে টাকা বাঁচবে, তোমার হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি—তুমিই মেরে দিয়ো।

আমি বুঝি মেরেছি আপনার টাকা? বাঁটকুল গজগজ করে।

আহা, রাগছ কেন? টাকার আবার আমার-তোমার কি? টাকা হচ্ছে সবার। টাকার আমদানি-পথটা খোলা রেখে, যাবার

আপনি বড় ভাল লোক।

পথটা বেশী পরিষ্কার করতে হয়। ও এমনি জিনিস, অনেকটা হাওয়ার মতই, ফাঁকা পেলেই এসে ঢুক্‌বে, আবার ফাঁক্ পেলেই

বেরিয়ে যাবে। যাতায়াতের পথ না পেয়েই ওর মুস্কিল—জমে গেলেই বিভ্রাট! এনতার আনো, আর এনতার ওড়াও!

আপনি তো বলেন, আনো! আসে কোত্থেকে? বাঁট্‌কুল আফসোস চাপতে পারে না। দিচ্ছে কে?

এই যে, আমিই দিচ্ছি। বলেছি তো, ওর থেকে যা ফেরৎ আসবে সব তোমার। যত খুসি ওড়াও! উড়িয়ে দাও চারধারে।

আমি ওড়াবো না, জমিয়ে রাখব। বাঁট্‌কুল জানায়।

সর্বনাশ করেছে—! হর্ষবর্ধন পকেট থেকে আরেকখানা বৃহদাকার নোট বার করেন: এটা হচ্ছে হাজার টাকার। এইটাই ওড়াও তবে। কিন্তু আর কিচ্ছুই রইলো না আমার কাছে। এক টাকাও না। উড়িয়ে দিলুম সব। এমনি করেই টাকা ওড়াতে হয়, তবেই টাকা আসে। তবে হ্যাঁ, রোজগার করে ওড়ানো চাই।

বাঁট্‌কুল আনন্দে আত্মহারা হয়ে হর্ষবর্ধনের গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে: আপনি ভারি ভালো লোক। সত্যি! ভারি ভালো!

এই! ওকি হচ্ছে!—গোবরা ফোঁস করে ওঠে: আমার দাদার গায়ে হাত দিচ্ছ যে বড়ো! ওকি? ওসব কি? বাঁট্‌কুলের আহ্লাদে-ব্যবহার ভালো লাগে না গোবরার—ওর চেয়ে দুর্ব্যবহারও অনেক ভালো। অনেক বেশী সহনীয়—অন্ততঃ গোবরার পক্ষে।

আহা! দিক্ না! ছেলে মানুষ, কী হয়েছে! আদর করছে বইত নয়! আমি কিছু আর ক্ষয়ে যাবো না তাতে! হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে থামান।

বাস্! নাই দিচ্ছ, যো পেলে আর কি! এইবার মাথায় উঠে বসবে! দেখো!

বসলই বা। কী আর হয়েছে! ছেলে মানুষই তো! খুব বেশী ভারী নয়তো আর! আমি কিছু ভেঙে পড়ব না তাতে? তুই

যে ছেলেবেলায় কত আমার কাঁধে চাপতিস—মনে নেই তোর? আমি কি কিছু বলেছি?

দাদার এই অপক্ষপাত গোবরার প্রাণে লাগে। সে আর বাঁট্‌কুল সমান হোলো? দাদা যে সত্যিই পর হয়ে যেতে বসেছে তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না। দুটো চোখই সজল হয়ে ওঠে ওর।

বেশ, থাকো তুমি ঐ ভরতের বাঁটুল আঁক্‌ড়ে। লক্ষ্মণ চললো। বৌদির কাছেই চললো লক্ষ্মণ!

গোবর্ধন বাড়ীর ভেতরে ঢুকে তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। সটান ছাতেই গিয়ে ওঠে।

বৌদি ওখানে এসেছে নাকি? বাঁট্‌কুলের বিস্ময়াকুল জিজ্ঞাসা।

বৌদি? ওই ছাতে? আমার যদ্দূর মনে হয়, বৌদি—মানে ওর বৌদি—এখানে নেই। সে এখন সুদূর আসামের আরেক ছাতে। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস!

তাহলে উনি যে এই ছাতে গেলেন, তাঁকে খুঁজতে?

ছেলেমানুষ! মাথা খারাপ হয়ে গেছে, বুঝছ না! ছেলে মানুষদের কি আর মাথা আছে। মাথাই নেই, তো, খারাপ হতে কতক্ষণ? হর্ষবর্ধন উদাহরণের দ্বারা তথ্যটাকে আরো বিশদ করে দ্যান: এই যেমন তুমি একটা ছেলেমানুষ! বলা নেই, কওয়া নেই, আমার গলা ধরে ঝুলে পড়লে হঠাৎ। ও আবার তেমনি আরেক ছেলেমানুষ। ওর তাইতে অভিমান হয়ে গেছে! আর কারো গলা না পায় তো, ছাতে গিয়ে, নিজের গলাতেই ফাঁস দিয়ে নিজের গলা ধরেই ঝুলে পড়বে কিনা কে জানে!

হর্ষবর্ধনের ভাবনাই হয়—এবং ভাবতে না ভাবতে এক মুহূর্তেই, প্রচণ্ড দুর্ভাবনায় তিনি পরিণত হয়ে পড়েন, বলেন: যাও তো, যাও তো। বলো গে, ও-ও নাহয় আমাব গলা ধরে ঝুলুক খানিক।

কি আর করব? ও ঝুলতে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যাই আবার! যা হয় হবে, না ঝুলে কি ঠাণ্ডা হবে ও? চটপট যাও। সামলাও গিয়ে ওকে, আগে। এই দেহ নিয়ে ছাতে উঠতে হলে তিন ঘণ্টা লেগে যাবে আমার। আমি আবার লাফাতে লাফাতে কোনো কাজই করতে পারিনা, ছাতে লাফিয়ে উঠতে হলে তো গেছি।

ততক্ষণে গোবর্ধন এসে, কার্ণিশের ধার ঘেঁসে, নীচের সকলের দৃষ্টিগোচর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তড়বড় ক'রে ঠোঁট নড়ছে তার—টা টি টুক্‌মুক্ টেন্ অ বাটায়!—দুর্দান্তভাবে আউড়ে চলেছে সে।

পরমুহূর্তেই, নেহাৎ শূন্যমার্গ লক্ষ্য করে তার প্রচণ্ড এক লাফ! পাখীদের মত ওড়বার উচ্চাভিলাষে ঠিক হনুমানদের হুবহু নকল!

॥ সাত ॥

হর্ষবর্ধনের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি

যা ভেবেছো তাই! একটা গাছই বটে। তোমার আন্দাজে ভুল হয়নি, ঠিকই ধরতে পেরেছ। যে-রকমটি সচরাচর সব গল্পের বইয়েই হয়ে থাকে।

এরকম ক্ষেত্রে একটা গাছ না থেকেই পারে না!

হনুমানের অনুকরণ করতে গিয়ে, গোবর্ধন যে-সময়ে, মাধ্যাকর্ষণের অনুসরণ করছে—অবিকল নিউটন-পরিদৃষ্ট সেই আপেল-ফলটির মতই—সেই সময়ে মাঝখান থেকে বাধা আসে। মধ্যপথে বাগড়া পড়ে; এই মারাত্মক মুহূর্তে যে ভুঁইফোড় গাছটা গোবর্ধন আর পৃথিবীর মাঝখানে মধ্যস্থতা করছিল, তারই একটা ডালের ফ্যাকড়ায় গোবরার কাছা আটকে যায়।

কারণ? কারণ আর কিছুই নয়, গল্পের এঁরা তো আর সহজে মরবার পাত্র নন্। অতএব, গল্পের খাতিরেই, গাছের সঙ্গে লটকে গিয়ে ঝুলতে থাকে গোবর্ধন।

ভাগ্যিস্ ওর হিন্দুস্থানীদের মত আঁটসাঁট কাপড় পরবার বদভ্যাস, তাই সে কোনো গতিকে টিঁকে থাকে।

কিন্তু এরকমভাবে কতক্ষণ আর টেঁক্‌সই থাকা সম্ভব? হর্ষবর্ধন ভারী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এই এই! তোমরা দেখছ কি! পড়ে মারা যাবে যে!

সকলেই হাঁ করে সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখছিল। এতক্ষণে হুঁস

হয়, এবার সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠে। বাঁটকুল একজনকে মোটা দেখে একটা দড়ি আনবার হুকুম দ্যায়।

দড়ি কি হবে? হর্ষবর্ধন তো অবাক।

কূপ থেকে যেমন করে ঘটি তোলে, তেমনি করেই টেনে নামাতে হবে তো? আটকে গেছে যে, দেখছেন না? আমরা দাড় ছুঁড়ে দিই, আর উনি দড়িটা ধরে ফেলে, গলায় কিম্বা কোমরে বেঁধে ফেলুন—আর আমরা সবাই মিলে এক হ্যাঁচকায় নামিয়ে আনি!

বাঃ, আর আছড়ে পড়ে হাত পা ভেঙে যাক ওর! বেশ আর কি? হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন।

তবে আর অন্য কী উপায় আছে? ড্রাইভারটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে এবার।

উঁহু, কূপের ব্যাপার না! মানুষ পুকুরে কি নদীতে ডুবে গেলে কি করা হয়? তাই করতে হবে। হর্ষবর্ধন বুঝিয়ে দ্যান্ ভালো করেঃ সেখানে লাফিয়ে গিয়ে জলে নামতে হয়, আর এখানে কেবল লাফিয়ে গিয়ে উঠতে হবে। ঐ গাছেই উঠতে হবে।

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। গাছে ওঠার উৎসাহ হয় না কারো। এক বাঁটকুল ছাড়া, গাছে উঠতেই কেউ জানেনা ওদের মধ্যে। জানলেও, যে কারণেই হোক, জান্ দিতে রাজি নয়, জান্ যাবার ভয় আছে তো! তবে সাঁতার অবশ্য কারো কারো জানা আছে, কিন্তু তাতে কি আর সুবিধে হবে!

বাঁটকুল বলেঃ বলুন, এক্ষুনি আমি উঠে যাচ্ছি! কিন্তু উনি তো আর ছোট্ট আমটি নন্ যে, আমি গিয়ে পেড়ে আনতে পারব? বলুন, বললেই আমি উঠি। একবার ঘাড় নাড়লেই হয়, আদেশের কেবল তার অপেক্ষা।

উঁহুহু! তোমার কর্ম না! হর্ষবর্ধন বলেনঃ হাতের চেয়ে

আম বড় যে! পারবে কেন তুমি? আর আমই বা কেন, গোবরাটা যা ধাড়ী, পেল্লায় একটা কাঁঠাল কি তরমুজেরও বাবা বলা যায় ওকে। ওকে পাড়তে গেলে তুমি মারা পড়বে।

বাবুমশায় অমন কাজটি করবেন নি—

গোবর্ধন প্রাণান্ত প্রয়াসে—কিম্বা একান্ত অনায়াসেই—নিজেকে এতক্ষণ ঝুলিয়ে রেখেছিল। কিন্তু ঝুলনযাত্রা তো কিছু আর অনন্ত

কাল চলতে পারে না? তার কাছার ধারণশক্তি যে ক্রমশঃই বেশ কমে আসছে, হৃদয়ভেদী এই রোমাঞ্চকর রহস্য ভালো করেই সে টের পেতে থাকে।

করুণ কণ্ঠে এই ভয়াবহ তথ্যটি সর্বজনসমক্ষে সে উদ্ঘাটিত করে: দাদা, আর—আর বেশীক্ষণ না, কাপড় ফাঁসল বলে! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও দাদা। তোমার দিব্যি, বৌদির দিব্যি, আর কক্ষনো আমি উড়ব না।

আমাকেই উঠতে হোলো দেখছি। অগত্যা হর্ষবর্ধনকে মরীয়া হতে হয়। আর কি কেউ গাছে উঠে ওকে পাড়তে পারবে? ওর টাল সামলানো কি অত সোজা? উঃ, সকাল থেকে কি ঝঞ্ঝাটটা না যাচ্ছে আজ! তিনি মালকোঁচা মারতে সুরু করেন।

বাধা আসে মালির তরফ থেকে। আর্তকণ্ঠে সে ককিয়ে ওঠে: বাবুমশয়, অমন কাজটি করবেন নি। গাছটি মারা পড়বেক্ তাহলে! আপনার ভর কি সইতে পারবেক্ ও?

অবোলা জীবের পক্ষ নিয়ে মালিকেই ওকালতি চালাতে হয়। এই পেয়ারা গাছটা ওর আবার ভারী পেয়ারের গাছ।

এই নামমাত্র গাছটা ওঁর গুরুভার বহন করতে পারবে কি না—সে-রকম দায়িত্ব-বোধ ওর আছে কিনা আদপে—এমনকি, তাঁর দায় ঘাড়ে নেবার পর ওর স্থায়ীত্ব সম্বন্ধেই হর্ষবর্ধনের সন্দেহ ছিল।

লটপট সিং একটা বুদ্ধি বার করে। প্রস্তাব করে যে তার মাথার পাগড়িটাকে খুলে চারজনে চার ধার শক্ত করে বেশ টান করে ধরুক, আর গোবর্ধনবাবু গাছ থেকে তার ওপর লাফিয়ে পড়ুক।

হর্ষবর্ধন তার তারিফ না করে পারেন না: লটপট সিং, তোমার মাথায় কেবল পাগড়ি নেই, বুদ্ধি ভি আছে বহুৎ। চটপট বিছাও পাগড়ি: ভাই হামারা গির্‌নে লাগা।

হর্ষবর্ধন, তুই দারোয়ান আর বাগানের মালি পাগড়িটা বিছিয়ে তার চার খুঁট বেশ শক্ত করে তুলে ধরে আর শ্রীমান গোবরা অবলীলায় তার ওপরে লাফিয়ে পড়ে।

পড়েই আবার সে লাফিয়ে ওঠে, ঠিক নিজের ইচ্ছায় নয়। ফুটবল যেমন মাটিতে পড়ে স্বভাবতই লাফায় অনেকটা সেইরকম। লাফিয়ে উঠতেই হর্ষবর্ধন ভাইকে লুফে নেন—কি জানি যদি আবার গাছে উঠে যায়।

গোবর্ধনও দাদার কোলে চড়ে দাদাকে জড়িয়ে ধরে।

বাঁটুকুল লাফাতে থাকে।

প্রথম থেকেই সে বেজায় রকম লাফাচ্ছিল! এহেন পতন-লীলা তার খুব মনের মতন, কিন্তু দুঃখ এই যে, প্রায়ই ঘটে না, কিম্বা ঘটলেও, আড়ালে-আবডালেই হয়ে যায়, চোখের সামনে কদাচই ঘটে থাকে। আনন্দ আতিশয্যে এসে ঠেকলেই বাঁটুকুলের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, স্বভাবতঃই, না লাফিয়ে সে স্থির থাকতে পারে না।

গোবর্ধন পেয়ারা গাছ থেকে অবতীর্ণ হলেও, ভূমণ্ডলে তখনো ঠিক উত্তীর্ণ হতে পারেনি—দাদার বেয়াড়া গাছেই অবস্থান করছে! কষ্টেসৃষ্টে সেইখানে বসেই সে বাঁটুকুলের লম্ফ ঝম্ফ চেয়ে দেখে আর রোষকষায়িত নেত্রে তাকায়।

অবশেষে সে আর থাকতে পারে না: আর লাফাতে হবে না, থামো—এই বলে সে নিজেই লাফিয়ে নেমে পড়ে—দাদার বাধা না মেনেই। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠ থেকে ঝাঁঝালো সুর বেরিয়ে আসতে থাকে: ভারী! ভারী ওঁর মন্ত্র! টাটি টুক্‌মুক্—দূর দূর! মন্ত্র না কচু! উড়তে গিয়ে মাঝখান থেকে পিঠ পেট টাটিয়ে গেল! প্রাণ নিয়েই টানাটানি আমার! টা টি না ছাই! সে বলে। মুক্তকণ্ঠেই বলে।

মন্ত্র না কচু, এই বলেই গোবরা থামে না, একটু পায়চারি করে হাত-পার আড় ভেঙে নিয়ে আবার সে যোগ করে, মন্ত্র না ঘেঁচু!

তোকে মারবার ষড়যন্ত্র! বুঝেছিস গোবরা! বাজে মন্ত্র দেবার জন্যে, হর্ষবর্ধনও বাঁট্‌কুলের ওপর চটে গেছলেন।

অনেকক্ষণ আগেই, দাদা! আজ সকালে যখনই ঐ শ্রীমূর্তি দেখেছি তখনই টের পেয়েছি। তার ঢের আগেই, যখন আজকের আনন্দবাজার পড়েছি, তখনই!

আস্ত একখানা নীট্! পঁচানব্বই হাজারের একখানা! হর্ষবর্ধন আনন্দবাজারের সর্বোচ্চতম সংবাদটি স্মরণ করিয়ে ছান, তবে বাঁচলে হয়!

বাজে মন্ত্র? বটে? বললেই হোলো, আর কি!—বাঁট্‌কুল এবার প্রতিবাদ করে: টা টি টুকমুক—ওই যাঃ! হয়েছে! একটু ভুলই হয়েছে বটে! ওটা ওড়বার মন্তর নয়, ওটা তো ব্যাঙ-লাফের মন্তর গো! তাই! সেই জন্যেই!

ব্যাঙ-লাফের মন্তর! গোবর্ধন দ্বিতীয়বার আকাশ থেকে পড়ে যেন।

ব্যাঙ-লাফের মন্তর! অবাক্ করলে বাপু!—হর্ষবর্ধনও বিস্মিত হন: ব্যাঙরা তো এমনিতেই লাফায়, নিজে থেকেই লাফ মারে, এই তো জানি! তাদের আবার মন্তর লাগে নাকি লাফাতে?

এই যে, এই রকম! বাঁট্‌কুল এবার উদাহরণের দ্বারা দেখাতে যায়: টা টি টুকমুক টেন্‌অ বাটায়—

মন্ত্র পড়ে, আর ব্যাঙের মতো এগুতে থাকে। এবং গোবর্ধন বড়ো বড়ো চোখ বার করে বাঁটকুলের ব্যাঙ-লাফানো ছাখে। একেবারে আসল ব্যঙ্গ রচনা। মন্ত্রশক্তির কীর্তি আর অস্বীকার করবার উপায় থাকে না।

লাফাতে লাফাতে হর্ষবর্ধনের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে বাঁটকুল। তিনি অমনি আঁৎকে উঠে পাঁচ হাত পিছিয়ে যান। পায়ের কাছে এলেই, ব্যাঙরা লিকুইডেশনে যায়, মানুষের গায়েই

আঁৎকে উঠে পাঁচ হাত পিছিয়ে যান—

জলবিয়োগ করে বসে, কেমন যেন ওদের চিরকেলে বদভ্যাস, হর্ষবর্ধনের মনে পড়ে যায় হঠাৎ।

বাঁট্‌কুল উঠে দাঁড়ায়ঃ দেখলেন তো! ওটা ওড়বার মন্ত্র না! ভুল করে গুলিয়ে ফেলেছি! ওড়বার মন্ত্র হোলো আলাদা। ডমরু ডিমি ডিমি ডিণ্ডিমো বোলো। এই হোলো আসল ওড়বার মন্ত্র।

কী বল্লে? ডমরু ডিমি ডিমি—? বিদ্যার্জনে গোবরার অগাধ আগ্রহ। একবার ফেল করে আবার পাসের প্রত্যাশায় পুনরায় পড়া নিতে সে পরাঙ্মুখ নয়।

ডিণ্ডিমো বোলে, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন! ওড়বার মন্ত্র দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ওড়বার মন্ত্রণা দ্যায়। দেখতে পারেন আরেকবার। আর একবারই তো!

হর্ষবর্ধন ছুটে এসে জাপটে ধরেন গোবরাকেঃ না, না, গোবরা! খবরদার না! উড়তে যাসনে আর! এবার উড়লে আর তোকে বাঁচাতে পারব না! কাছা আটকালেও না।

নতুন করে পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে লটপট সিংও তার অসম্মতি জানায়ঃ ওইসা মৎলব ফিন্ মৎ ফাঁদিয়ে বাবুজি! গোবরার এবং পাগড়ির দুজনের মুখ চেয়েই সে বলে।

আর—বারম্বার উড়লে গাছটার ওপরেও অবিচার করা হয় নাকি? কবার একজনের পক্ষে অপরের ঝক্কি নেওয়া সম্ভব? সামান্য একটা গাছ বইতো নয়! গাছের তরফে ওকালতির সঙ্গে জজিয়তির ` ক্ত জুড়ে দিয়ে হর্ষবর্ধন তাঁর বক্তব্যকে জোরালো করেন।

গোবর্ধন বাঁট্‌কুলকে ভেংচি কেটে ছ্যায়ঃ মন্ত্র না ছাই! ও হচ্ছে ডিমের মন্ত্র! কাঁচকলা!

না উড়বেন নাই উড়বেন! বয়েই গেল আমার! বাঁট্‌কুল ঠোঁট উলটে ছ্যায়ঃ এক্ষুনি নিজে উড়ে দেখিয়ে দিতে পারি, হ্যাঁ।

হর্ষবর্ধন বলেনঃ সে কথা মন্দ না। তুমি নিজে উড়ে দেখতে

পারো বরং! তোমার বেলা গাছের বড় দরকার হবে না। আমিই নীচে থেকে রসগোল্লার মত টুক্ করে ঠিক লুফে নিতে পারব!

বাঁট্কুল কিন্তু কী ভেবে নিরস্ত হয়, না! আজ থাক্! অন্ধকার হয়ে আসছে এখন, অন্যদিন হবে, তাছাড়া সারাদিন আজ আপনাদের খাওয়া দাওয়া হয়নি, তার যোগাড় করিগে।

সেই ভালো! হর্ষবর্ধন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। গোবরাও দাদার বাহুপাশমুক্ত হয়ে রক্ষা পায়।

বাঁট্কুলের সাঙ্গোপাঙ্গ সবাই, একে একে, সুদূরপরাহত হয়ে গেলে হর্ষবর্ধন বলেন: উড়তে গেছলি কেন? ছি ছি! এত বোকা তুই? ওড়ে আবার মানুষ! ফোতো কাপ্তেনরাই তো ওড়ে কেবল! ভদ্রলোকের কি উড়তে আছে? ছ্যা!

তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যেই তো! ঠোঁট ফুলিয়ে বলে গোবরা। ভারী গলাতেই বলে: দেশে উড়ে গিয়ে, বৌদিকে নিয়ে, দলবল সব নিয়ে এসে পড়তাম এখানে।

উদ্ধার! উদ্ধারের কথাও উচ্চারণ করিসনে! বিদেশ বিভুঁয়ে যে সব বিচ্ছু লোকের পাল্লায় পড়া গেছে তাতে আর এজন্মে উদ্ধারের আশা নেই। হ্যাঁ, এদের হাত থেকে আবার উদ্ধার!

এখানেই পচতে হবে সারা জন্ম?

উপায় কি? হর্ষবর্ধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালেন: বরাতে যা আছে, কে খণ্ডাবে? তুমি নেপালে গেলেও এই দশা! একেই বলে কপালের লেখন!

কপালের লেখন না কচু!

বেশ, উদ্ধার হতে গিয়ে দেখলি তো? একবার বাঘের পেটে যাচ্ছিলি, আরেকবার গাছের পিঠে আটকালি! আর উদ্ধারের নামটিও করিস্নে! তবে যদি, হ্যাঁ, কখনো—

দারুণ অন্ধকারের মধ্যে তিনি যেন একটুখানি আশার আলো দেখতে পান। কখনো যদি বাটপারেরা আসে, বলা যায় না তবে !

বাটপার ! বাটপারেরা কেন আসতে যাবে ? গোবরা বেশ বিস্মিতই হয়।

কেন আসতে যাবে, কে বলবে ! এরা কেন এল ? না ডাকতে না সাধতে এমনিতেই ওরা এসে যায়। ঠিক জানিস, চোর থাকলে, বাটপাররাও আছে। চুরির ওপর বাটপারি করতেই ওদের আমোদ ! ওই ওদের পেশা ! এক যদি ওরা এসে পড়ে, তবেই উদ্ধার !

বাটপাররা এসে উদ্ধার করবে আমাদের ? গোবরার চোখ ক্রমশই আরো বড়ো হয়।

এখন তো চোরাই মাল আমরা, আমাদের আর গতি কি ? এখন কেউ যদি আমাদের বাটপারি করে নিয়ে যায় তবেই আমাদের গতিমুক্তি।

কিন্তু—কিন্তু গোবরা কিন্তু-কিন্তু করে, তথাপি।

আর কিন্তুমিন্তু নেই। ঐখানেই যা আশা, ভরসা ভায়া !

কিন্তু বাটপারের হাত থেকে বাঁচবে কিসে ?

আরে যাঃ ! সে তো পরের ভাবনা, এখন কেন ? বাটপারেরও আবার বড়দারা রয়েছেন—এমনি করে হাত-বদল হতে হতে যদ্দূর যাওয়া যায়। চাই কি, এইভাবে আসাম পর্যন্ত পৌঁছে গেলেও যেতে পারি। কিন্তু সে কথা তো নয়, আমি ভাবছি কি, আমরা যেরকম লাট-করা, বস্তাপচা সস্তামাল, তাতে বাটপারেরা এলে হয় ! সেই কথাই কেবল ভাবছি আমি।

হর্ষবর্ধন হায় হায় করেন ! গোবর্ধনও হা হুতাশ করে।

চৈত্রমাসের মতো হু-হু করে দুজনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

● রূপ-কাহিনী

সুনন্দা ঘোষ	:	রূপকথার সাজি	১·৫০

● সংকলন

খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দের লেখায় সমৃদ্ধ	:	আহ্লাদে আটখানা	৩·০০
কবিগুরুকে নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলি	:	প্রণাম নাও	৪·০০

● বাছাই করা গল্পের সিরিজ

বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোঃ, হেমেন্দ্র কুমার, শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, শিবরাম, প্রেমাঙ্কুর, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার ইত্যাদির	ছোটদের ভালো ভালো গল্প		২·০০
		প্রতিটি	০·৮০

● জীবনী সাহিত্য

স্বদেশরঞ্জন দত্ত	:	যাঁরা মহীয়সী	২·০০
	:	বিদ্যাসাগর	০·৮০